সংবাদ প্রতিদিন
৩১ ডিসেম্বর ২০০৬

রোববার

শালতামামি



সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ ইউসুফ খান

স্ক্যান ঃ অভিজিত ব্যানার্জী

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


অঞ্জলি
জুয়েলার্স™

এ
এই
রোববার

৩১ ডিসেম্বর ২০০৬

সৌজন্য

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়
শাদ আলি
যীশু সেনগুপ্ত
স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়
আরতি দত্ত
এবং
যাঁদের কাছ থেকে দুর্মূল্য
শালগুলি পেয়েছি

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস
কর্তৃক বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড,
২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে
মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে



মার অনেক ভয় দেখাল, অনেক কুৎসিত লোভ দেখাল।
তপাসনে বসা সিদ্ধার্থ শান্তস্বরে বললেন 'তোমার এই ভয় আমি নিলাম না। এ তোমারই রইল।'

আমরা, বাংলার মানুষ, অহিংস আন্দোলন বড় একটা দেখিনি। আমাদের নায়ক ক্ষুদিরাম বসু, বিনয়-বাদল-দীনেশ, চট্টগ্রামের মাস্টারদা। আমরা ছোট্টবেলা থেকে, কিচ্ছু না জেনে না বুঝে, গলা ফাটিয়ে বলে এসেছি—'না গান্ধী নয়। সুভাষচন্দ্র।' ভেবে দেখেছেন কখনও, কেন?'

আপাত একটা কারণ অনুমান করতে পারি। সুভাষচন্দ্র বীর যোদ্ধা। তিনি সামরিক পোশাক পরেন। আর, গান্ধী বৃদ্ধ, অশক্ত—তাঁকে নায়কোচিত ভাবা মুশকিল।

অবলীলায় স্বীকার করতে পারি, আমি নিজেও বহুদিন তাই ভাবতাম। মনে হত মহাভারতের দ্রৌপদী আর গান্ধী যেন এক। কথায় কথায় প্রয়োপবেশন। 'এ আবার কী আহ্লাদেপনা।? খাবি না, খাবি না—নিজে বোঝগে যা! আর লোকগুলোই বা কী? সাধতেই বা যায় কেন?'

পরে বুঝেছি, এই সত্যাগ্রহ অন্তরের শক্তি। প্রতিবাদের এক চূড়ান্ত প্রতিমা। যার সামনে গিয়ে সমস্ত অত্যাচার কুঁকড়ে, গুটিয়ে ফিরে আসে।

মেদিনীপুরের জুনপুট অঞ্চলে একটা গ্রাম আছে— নাম পিছাবনি। শুনেছি, আদিতে নাকি নাম ছিল কমলাপুর (বোধহয় ভুল বলছি না)। লবণ আইন অমান্যর সময় স্থানীয় মহিলারা মাটি আঁকড়ে বসে পড়েছিলেন সেখানে। পুলিশের লাঠির গুঁতোর মুখে একটাই কথা বলেছিলেন—পিছাব নি (অর্থাৎ, পিছোব না)।

সেই সমবেত স্বর আজ সেই গ্রামের পরিচয়। তার ইতিহাস, তার পুরাণ।

যতদূর জানি, কম্যুনিজম বলে—শেষ অবধি নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করার জন্য মধ্যপথে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমাজ বা রাষ্ট্রশাসনের অধীন হতে হবে।

সত্যাগ্রহ বলে—অহিংসার পথে কোনওদিনই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সমাজের শাসনের কাছে পদানত করবার প্রয়োজন নেই।

সত্যিই, প্রয়োজন নেই। মারের মুখে প্রশান্তি অনেক বড় পাল্টা মার। তার আর কোনও মার নেই।

সিঙ্গুর জমিরক্ষা কমিটির বহু মানুষ, বহু পর্যায়ে নিশ্চুপে নির্বিরোধে অনশন করে বহুদিন পরে আবার নতুন করে বুঝিয়ে দিলেন সেই অন্তরতম শক্তির বিস্তার।

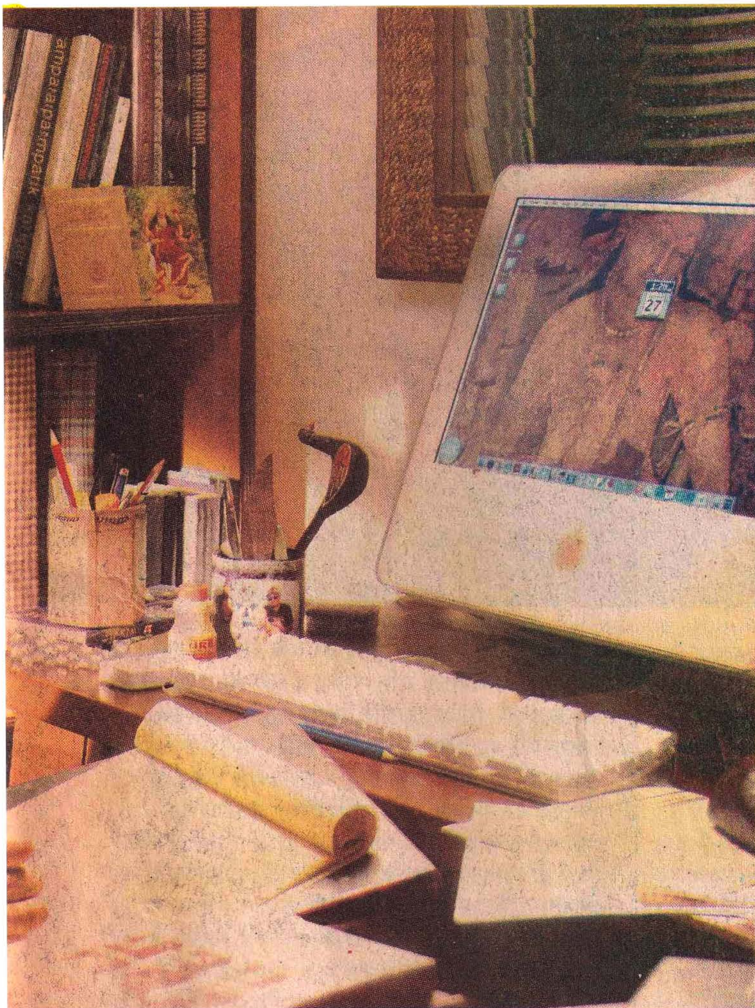
তাঁদের কোনও ছবি উঠল না। তাঁদের নাম আমরা জানলাম না। তাঁরা দিব্যি বুঝতে পারলেন যে এই মানচিত্রেরই অন্য কোথাও তাঁরা কখনও রাজনৈতিক ফায়দার হাতিয়ার, বা মিডিয়ার লোভনীয় স্টোরি—তবু কিছু বললেন না।

এক চিত্রসাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সে বলল 'কোনও সময় পাচ্ছি না, জানো। সকাল থেকে সিঙ্গুরে গিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে তো।' জিজ্ঞেস করলাম 'তোরা তো সিঙ্গুর নিয়ে কিছু লিখছিস না। তবে যাচ্ছিস কেন?' বলল 'না, না! বুঝতে পারছ না, যদি কিছু ঘটে যায়?'

ঘটে যায় মানে? প্রতিনিয়ত যেটা ঘটছে, এতগুলো মানুষের এতদিনের অস্তিত্বের সংকট— সেটা ঘটনা নয়, যথেষ্ট?

সিঙ্গুরে পাঁচশো বাচ্চা একদিন অনশন করেছে— সেটা ঘটনা নয়? আর বিধানসভার ভগ্নদশা দেখতে এসেছে ক'টা

মিডিয়া সবার অজান্তে একটা আন্দোলনের গায়ে একটা বিশেষ মানুষকে সেঁটে দেয়, যাতে সেই মানুষটার ত্রুটি-বিচ্যুতিই সেই আন্দোলনটার স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়...



বাচ্চা, সেটা ঘটনা? চৌরঙ্গির ধর্ণামঞ্চে কে এলেন, কে এলেন না ; তাপসীকে পুড়িয়ে মারার আগে ধর্ষণ করা হয়েছিল কি হয়নি; চব্বিশ ঘণ্টার বন্‌ধ হবে না আটচল্লিশ ঘণ্টার,— এগুলোই তাহ'লে ঘটনা কেবল? চমৎকার!

মিডিয়া বড় চতুরভাবে, কখন যে সবার অজান্তে, কোনও একটা আন্দোলনের গায়ে একটা বিশেষ মানুষের পোস্টার সেঁটে দেয় সেটা বুঝতেও দেয় না। এমনভাবে দেয়, যাতে সেই মানুষটার ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিই আন্দোলনটার স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

বন্‌ধ হয়েছে কি হয়নি, তাতে কার জয় হয়েছে, কে পরাজিত- সেটা কি সত্যিই বিবেচ্য?

আমরা প্রশাসনের ঔদ্ধত্য নিয়ে অনেক কথা বলছি। কিন্তু যখন আচমকা একটা রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে হঠাৎ একটা বন্‌ধের ডাক ছুঁড়ে দেওয়া হয়, সেটা কি কম উদ্ধত?

কাদের জন্য বন্‌ধ? তাঁরা কি চেয়েছেন বন্‌ধ? সিঙ্গুরের মানুষকে একবার জিজ্ঞেস করেছি আমরা? তাঁদের না জানিয়ে তাঁদের হয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া—তাঁদের অবমাননা নয়?

এই কথাটা তো কেউ বললেন না। সাধারণ মানুষের অসুবিধের কথা বললেন, হাইকোর্টের অর্ডারের কথা উঠল। কেউ তো বললেন না, যে সত্যাগ্রহে অনমনীয়তার কোনও স্থান নেই।

সিঙ্গুর আজ কেবল একটা স্থাননাম নয়। বাংলার মানুষের ইতিহাসে হয়তো সিঙ্গুর কথাটা এখন থেকে 'আন্দোলন'এর সমার্থক হয়ে দাঁড়াল। যে আন্দোলন সাধারণ মানুষের। যেখানে নেতৃত্ব দেবার আমরা কেউ নই। তৃণমূল নয়, সি পি এম নয়, বুদ্ধিজীবীরাও নন...

আমাদের মধ্যে একটা প্রচলিত সৌখিন বুলি আছে, 'চল, আমরা গ্রামে গিয়ে কাজ করি। ওদের শেখাই।' এই নাগরিক উন্নাসিকতা একটু দূরে সরিয়ে রেখে তাকালেই দেখতে পাব, যে আমরা গ্রামকে শেখাব কয়েকটা ইংরিজিতে লেখা অক্ষর। আর, গ্রাম আমাদের শেখাবে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস। যার কাছে আমরা সকলেই নতজানু। যার চোখে চোখ রাখবার মতো ক্ষণজন্মা বড় কম। কালেভদ্রে, একটা কার্ল মার্ক্স...একটা রবীন্দ্রনাথ... ব্যস্।

এই আন্দোলনে কোনও নায়ক নেই, কোনও খলনায়ক নেই। আছে এক প্রবহমান সভ্যতা। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা সকলে। আমাদের সীমিত বোধ আর অসীম অবাচীনতা নিয়ে।

আসুন, একবার অন্তত সবাই মিলে সেই সভ্যতার শরিক হই। তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে আপনিই বুঝতে পারব—সত্যিকারের উন্নয়ন কাকে বলে।

আশা করতে বড় ভয় হয়, তবু কামনা তো করতে পারি—দু হাজার সাত সকলের জন্য শুভ হোক। সর্বজনীন কল্যাণের হোক।

মমতা, আপনাকে বলছি। মহাশ্বেতাদি আপনাকে অনেক অনুরোধ করেছেন—অনশন ভাঙতে, নতুন করে নেতৃত্ব দিতে, ইত্যাদি, ইত্যাদি...।

আমি কেবল একটা ছোট্ট অনুরোধ করব?

দয়া করে কয়েকদিনের জন্য অন্তত মিডিয়ার ক্যামেরাকে প্রত্যাখ্যান করুন।

যদি সত্যিই সত্যাগ্রহে বিশ্বাস করে থাকেন, তার এই অপরিসীম শক্তিকে লঘু করে দেবেন না।

ভাল থাকুন সবাই।

ঋতুপর্ণ ঘোষ

ভা

ভাল-বাসার বারান্দা

নবনীতা দেবসেন



আমার মা-বাবার বিয়ে হয়েছিল লিলুয়াতে, ৩১ মে, ১৯৩১, দেবেদের একটি ছোট বাগান বাড়ি, দেবালয়ে। আমি কিছুই জানি না মা কেমন করে তাঁদের ভবানীপুরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে লিলুয়া অবধি গিয়েছিলেন, কার সঙ্গে? বাবা তো বসেছিলেন লিলুয়ার বাড়িতে মায়ের পথ চেয়ে। আমার মা কোথাও একা একা যেতে পারতেন না। কুঞ্জ পথে সখি কেয়সে যাওব অবলা কামিনী রে! — সেটা ছিল জ্যৈষ্ঠ মাস, কালবৈশাখী ঝড় উঠেছিল কি? ঘন ঘন রিম ঝিম রিম ঝিম রিম ঝিম - বৃষ্টি পড়েছিল কি মায়ের যাত্রাপথে? কে ছিলেন মায়ের দুর্জয় অভিযানের বিশ্বস্ত সাথী? আমার কোনও দিনও জিজ্ঞেস করা হয়নি। একা একা যেতে সেদিন সেই মেয়েটার ভয় করেনি? সেই মেয়েটার জন্যে আমার মন কেমন করে।

মায়ের বিধবা বিবাহের অনেক রিপোর্ট পাওয়া যায়। পরের দিনই বাংলা এবং ইংরেজি কাগজে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল। গোপনতার কিছু ছিল না। বঙ্গবাণীতে বেরুলো, ' রাধারানী-নরেন্দ্র দেব-বিবাহ, কন্যার আত্মসম্প্রদান'। দেবালয় গৃহে বহু নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য মানুষের সাক্ষাতে সে দিন মা নিজেই নিজেকে সম্প্রদান করেছিলেন বাবার হাতে। উপস্থিত ছিলেন জলধর সেন, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গিরিজাকুমার বসু, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, প্রফুল্লকুমার সরকার, প্রমথ চৌধুরি, গিরীন্দ্রশেখর বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুধীরচন্দ্র সরকার, প্রেমাংকুর আতর্থী, নলিনীকান্ত সরকার এবং আরও অনেকে। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী বলেছিলেন, বৈদিক মতে বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যার পক্ষে আত্মসম্প্রদান শাস্ত্রীয় বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান।

আমাদের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের অপরাজিতা দেবীকে লেখা একাধিক চিঠি আছে, কেয়ার অফ রাধারানী দেবী, দেবালয়, লিলুয়া। সেই বাড়ির বিষয়ে আমার যা কিছু জানা সবই পরস্মৈপদী। অনেক জায়গায় বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির জগতের প্রসঙ্গে ওই দেবালয় বাড়ির কথা আমি পড়েছি, প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের আড্ডা ছিল ওই বাড়িতে। কে না এসেছেন ওই দেবালয় বাড়িতে। শরৎচন্দ্রের চিঠিতেও ওই বাড়ির বহু উল্লেখ আছে। বিয়ের পরে মা বাবা ওখানে কয়েক বছর ছিলেন, বোধহয় ১৯৩৫ পর্যন্ত। ছোটবেলাতে একজনের মুখে লিলুয়ার বাড়ির গল্প খুব শুনতুম। গুনিয়া ভাই, যার হাতে আমি মানুষ (?) হয়েছি।

গুনিয়া ভাই উড়িষ্যার ছেলে, সে আর তার দাদা রঘুভাই ছিল ও বাড়ির বাগানের মালি। আমাকে ভাত খাওয়াতে খাওয়াতে গুনিয়া ভাই যে বাড়িটার গল্প বলত, সে বাড়ির বিষয়ে আমি বড় হয়ে কোথাও কিছু পড়িনি। সেই বাড়ির পুকুরে মাছ ছিল, আর ছিল সব্জি খেত। বাজারে কিছু নাকি কিনতেই হত না। আর কতরকমের ফলের গাছ। আম, কাঁঠাল, লিচু, নারকেল। বাড়ির গাছের ডাব পেড়ে দেওয়া হত অতিথিদের। গুনিয়া ভাই বলত ও বাড়িতে হাঁস মুরগি পোষা হত, তাদের ধরতে আবার রাত্তিরে নাকি শেয়াল আসত। দু দুটো আস্তাবল ছিল। (যদিও একটা ঘোড়াও ছিল না), চারিদিকে মাঠ, ক্ষেত, ঝোপ ঝাড়, আর বুনো জংলা জমি ছিল। গুনিয়ার দেশের মতোই অনেকটা যেন। তার মুখের ওই লিলুয়ার বাড়ির গল্প আমি, আমাকে ভাত খাওয়ানোর জন্যে বানানো রূপকথার গল্প বলেই ধরে নিয়েছিলুম, মা বাবাকে তো কখনও অত সব মাছ সব্জি ফল ফুলুরির গল্প করতে শুনিনি।

কিন্তু ওই দেবালয় গৃহটি বিক্রি করে তবেই এই ভাল-বাসা বাড়ি তৈরি হয়, যে-বাড়িতে এই শ্রীমতীর ভূমিষ্ঠ হওয়া।

শুনেছি দেবালয় বাড়িটি লিলুয়া ইস্টিশনের পাশেই ছিল, ট্রেন ঢুকছে দেখতে পেলে তবে সে বাড়ির লোক জনে ইস্টিশনে যেতেন। মাঠ পেরিয়ে শরৎচন্দ্র জোড়া ইলিশ হাতে ঝুলিয়ে আসছেন, তাও দেখা যেত। আর মা বেচারি শ্বাস কষ্টের রুগি, রেলগাড়ির কয়লার ধোঁয়ায় তাঁর বড় কষ্ট, মায়ের হাঁপানি হত। কবিরাজ মশাইয়ের পরামর্শে তাই অমন বাগানবাড়ি ছেড়ে ওঁরা উঠে এসেছিলেন বালিগঞ্জে, লেকের ধারে।

এ পাড়াও তখন অভিজাত বাগান বাড়িরই পাড়া ছিল। ভাল-বাসা কে তার মধ্যে একটু আলাদা, একটু অতি



আগে, ট্রেনে ক'রে গেলে জানলা দিয়ে বাড়িটা খুঁজতাম। এখন থেকে আর খুঁজব না।

আধুনিক দেখাত। জায়গা কম, বাগান নেই। ছড়ানো নয়, ওপরদিকে উঁচু। তবে হ্যাঁ, বারান্দা আছে। যেদিকে যাও শুধু বারান্দা। বাবার ডিজাইন, মায়ের সবদিকে আলো বাতাস চাই না? কর্নার প্লট, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সবই দেখা যাবে।

এক দিন এক অপরিচিত যুবক এলেন। এসে অত্যাশ্চর্য একটি প্রস্তাব দিলেন, শুনে আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। 'আমরা লিলুয়ার অধিবাসী, আমরা দেবালয় বাড়ি নিয়ে অনেক গল্প জানি, ঐতিহাসিক বাড়ি, আমাদের কাছে কিংবদন্তি প্রতিম, অথচ আপনি কোনও দিনও যাননি। শেষ হয়ে যাবার আগে যেটুকু আছে আপনি একটু দেখে নিন। অন্তত এই সত্তর বছর যারা ওখানে আছেন, তাদের মুখে শুনে নিন বাড়িতে কী কী ছিল। এবারে দেবালয় মাটিতে মিলিয়ে যাবে, প্রোমোটরের হাতে।'

তার পরে এল ১৭ই ডিসেম্বর, ২০০৬। পৌঁছলুম। এ কী? এ তো উত্তর কলকাতার সরু সরু গলি, খোলা মাঠ কই? ইস্টিশন দেখা যায় না, রাস্তাটার নাম যদিও স্টেশন রোড। চতুর্দিকে দোকান বাজার, ঘিঞ্জি, জনবহুল, শুধু অট্টালিকা, গাড়ি, ভিড়, এ কোথায় এলুম রে বাবা? দূর, ইয়ারো আনভিজিটেড থাকলেই যে ভাল ছিল। একটি একতলা, ভাঙাচোরা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি, চারিপাশে উঁচু নিচু ঘর। বাড়ি ঘেরা কোনও বাগানের চিহ্ন নেই। ইট, কাঠ, বালি, বাঁশ ছড়ানো এদিকে-সেদিকে। কোনওরকমে তো ঢুকলুম।

বর্তমান মালিক অত্যন্ত ভদ্রলোক, ঠিক যেন আমাদের আত্মীয়, এমন সুরে তখন আমাকে বলছেন, 'দিদি, আপনাদের ছিল সোয়া তিন বিঘে জমিতে বাড়ি, ওই যে ওই দিকে মস্ত গোলাপ বাগান ছিল, সেখানেই আমাদের কারখানা। এইদিকে কাজের লোকজনের কোয়ার্টার ছিল, উঠোনে রান্নাঘর ছিল তিনটে, আপনার মায়ের হাঁপানি থেকে দূরে, যেখানে এই নয়া বিল্ডিং উঠছে। আর ওইদিকে নারকেল গাছগুলো ছিল, আম, কাঁঠাল, লিচু, সফেদা। প্রচুর ফলমূলের গাছ ছিল, এখন শুধু একটা পেয়ারা গাছ আছে। পেয়ারা হচ্ছে এখনও, নিয়ে যান। ওই যে নতুন চারতলা বাড়ির আজ উৎসব, গেটে কলাগাছ লাগানো, ওইখানেই ছিল আপনাদের পুকুরটা। বুজিয়ে বাড়ি উঠেছে। আসুন, ভিতরে আসুন, আপনাদের বৈঠকখানা ঘরে বসুন, এখানে অনেক মানী গুণী মানুষরা আসতেন আপনার মা বাবার কাছে।'

মস্ত বড় একটা ঘরে ঢুকলুম আমরা। পাঁচটা কার্পেট আর বহু চেয়ার পাতা হয়েছে। বেশ কিছু বৃদ্ধ বৃদ্ধা সেখানে বসে আছেন। 'এই ঘরটা অবশ্য আধখানা, আমরা মাঝখান দিয়ে দেওয়াল তুলেছি। এই যে দেখছেন মেঝেতে পাথরের পদ্মফুলের আলপনার আধখানা, এর বাকি আধখানা আছে পাশের কামরায়। এ ঘরের মেঝের দুই কোণে দুটো কলকা আছে, আর ঐ ঘরের মেঝেতে দুই কোণে দুটো -- চলুন, দেখবেন, ছবি তুলবেন?'

বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অনেকেই স্মৃতিচারণ করলেন, শুনতে শুনতে মনে হল যেন গুনিয়া ভাইয়ের মুখে গল্প শুনছি। সেই পুকুরের মাছের গল্প, বাগানের ফলের গল্প, গোলাপ বাগিচার গল্প। তা হলে ওগুলো রূপকথা ছিল না? সত্যি সত্যি ছিল এসব?

'এবার আসুন দিদি আপনাকে আসল সারপ্রাইজটা দেখাই। একটি দীর্ঘ আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজ আছে এই বাড়িতে। আপনি কি জানতেন? আমার মনে হয় আপনার বাবা মাও জানতেন না, দলিলে কোনও উল্লেখ নেই।

দালানের একটা অংশ থেকে চৌকো মেঝের টুকরো তুলে ফেলা হল, দেখি সিঁড়ির ধাপ নেমে গিয়েছে পাতালে। টর্চ হাতে করে আমার সাহসী ছেলে কানাইবাবু নেমে গেলেন অন্ধকারে। তিরিশ ফুট লম্বা পাঁচ ফুট চওড়া সাড়ে ছ'ফুট উঁচু ওই পথ যে কোথায় যাচ্ছিল কেউ জানে না। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওঁরা নিজেরাও এর অস্তিত্বের খবর জানতেন না। এটা সদ্য আবিষ্কার করেছেন মিস্তিরিরা, পয়ঃপ্রণালীতে কাজ করার প্রসঙ্গে মেঝে খুঁড়তে গিয়ে।

রহস্যের গন্ধ পেয়ে লিলুয়াবাসীরা যার পর নাই উত্তেজিত, অভিভূত। বলা বাহুল্য, আমিও। যদিও মাটির তলায় সুড়ঙ্গের ভিতরে ফাঁকা রহস্য ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি, মোহরের ঘড়াও না, যক্ষের কংকালও না। শুধু একদা পারিবারিক বসত বাটীর একটুকরো আংশিক ইতিহাস, যার আগাও জানি না, পিছুও জানি না। আমাদের প্রকৃত বসতবাটী তো লিলুয়াতে নয়, ঠনঠনে কালীতলা। বাপ-ঠাকুর্দাদের জন্মস্থান সেইখানে।'

আমার আবার মন কেমন করে উঠল নববিবাহিত সেই দুঃসাহসী দম্পতির জন্যে, যাদের হার না মানা ভালবাসার স্পর্শ জড়িয়ে আছে এই ভাঙাচোরা বাড়িটির ইঁট পাথরে। পুরনো বাড়িতে হয়তো ঠাঁই হয়নি, বিধবাবিবাহ বলে কথা! আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই লিলুয়ার প্রিয়জনদের। দেবালয়ের ১৯৩৫ এর তোলা ফোটোগ্রাফ বাঁধিয়ে উপহার দিলেন তাঁরা আমাকে। বাগান বাড়ি। মাঠের মাঝখানে। সুন্দর। যেমনটি হবার কথা ছিল। মন ভাল হয়ে গেল।

রূপকথা সুসম্পূর্ণ হল। অনেক গল্প শুনে, অনেক আদর, আর দেবালয়ের পেয়ারা পকেটে নিয়ে, অনেক বিস্ময় বুকে ভরে নিয়ে ভাল-বাসাতে ফিরে এলুম, আজ আমি একজন অন্য নবনীতা।

লিলুয়াবাসীরা বললেন, ওঁরা চান, স্টেশন রোডের নাম যেন হয় রাধারানী-নরেন্দ্র সরণি। লিলুয়ার গৌরবের স্মৃতি।

আর আমি ওঁদের কাছে একটা ছোট বিনীত অনুরোধ রেখে এসেছি, নতুন বছরে এখানে যে নতুন সৌধটি উঠবে, তার নাম যেন হয়, দেবালয়। ক্ষতি কী?

প্রসিদ্ধ সংস্কৃতিবিদ, শিল্প সংগ্রাহক **গুরুসদয় দত্ত** কাশ্মীরি শাল সম্পর্কে একটি দীর্ঘ রচনা আরম্ভ করেছিলেন। কোনও কারণে লেখাটি অসম্পূর্ণ এবং অপ্রকাশিত থেকে গেছে। তাঁর পুত্রবধূ প্রয়াত আরতি দত্তর কাছে এই পাণ্ডুলিপিটি সযত্নে রাখা ছিল। এই রচনাটি হাতে আসার পরই শাল নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা করতে ইচ্ছে হল আমাদের।



এ মোহ আবরণ

(১)

"ঝিলমচুম্বিত এই কাশ্মীর উপত্যকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাহার শাল। সম্ভবত এটি পারস্য শব্দ যাহার অর্থ 'সূক্ষ্ম তন্তুজাত পশম বস্ত্রখণ্ডবিশেষ'। বয়নশিল্পের এইরূপ সূচারু নির্মিতি পূর্বে কখনও অবলোকন করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। বিশেষ করিয়া আরও আশ্চর্য লাগে যখন দেখি—এই অপূর্ব বস্ত্রখণ্ড নির্মাতারা কেবলই পুরুষ এবং কিয়ৎক্ষেত্রে ইহাদের সহকারী নিতান্তই কতিপয় বালক মাত্র। এই বস্ত্রখণ্ডগুলি সাধারণত দৈর্ঘ্যে ১.৮০ মিটার এবং প্রস্থে ১.২০ মিটার। বস্ত্রখণ্ডের পাড়ের নক্সা অধিকাংশ সময় পাইনপত্রের অনুকৃতি এবং ৩০ সেন্টিমিটার প্রস্থ জুড়িয়া ব্যাপ্ত। মুসলমান এবং হিন্দু ভারতীয়রা, উভয়েই মস্তক আবৃত করিয়া বামস্কন্ধের উপর দিয়া ইউরোপীয় ক্লোকের ন্যায় ন্যস্ত করিয়া এই বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া থাকেন।...

দুই ধরনের 'শাল'এর নমুনা প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রথমটি, আঞ্চলিক সূক্ষ্ম পশমনির্মিত এবং দ্বিতীয়টি বিশেষ কোনও অরণ্য ছাগের বক্ষদেশের সূক্ষ্ম রোমরাজি হইতে প্রস্তুত। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রকারের শাল নির্মাণ অনেক বেশি দুরূহ। ফলে ইহা নিতান্তই দুর্মূল্য।...

অতীব বেদনার কথা এই যে, অধিকাংশ সময়ে এত যত্ন, শ্রম ও শিল্পশৈলীমণ্ডিত এই অপূর্ব নির্মাণ পৃথিবীর ইতিহাসে যাহা সূক্ষ্মতার দৃষ্টান্তস্বরূপ হইতে পারিত, তাহা সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। ফলে মানব সৃষ্টির এই অনবদ্য নিদর্শন অধিকাংশ সময়ে কীটের আহার্য হইয়া থাকে।"

১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে Francois Bernier, শোনা যায় ইনিই প্রথম ইওরোপীয় পর্যটক যিনি কাশ্মীর উপত্যকা পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত Voyage dans les Etats du Grand Mogol নিঃসন্দেহে প্রথম ইওরোপীয় জার্নাল যাহাতে কাশ্মীরি শালের উল্লেখ আছে। উপরিউক্ত বর্ণনাটি যতদূর সম্ভব শাল সম্পর্কিত প্রথম ঐতিহাসিক দলিল।

শাল নির্মাণ শিল্পকে প্রতিষ্ঠান করিয়া তুলিবার অধিকারী নিঃসন্দেহে সুলতান জায়ান-আল-আবেদিন হইতে পারেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুর্কীস্তান হইতে নাখজ বেগ নামক এক অপরিসীম দক্ষ তন্তুবায়কে তিনি আমন্ত্রণ করিয়া আনেন কাশ্মীর রাজ্যে শাল নির্মাণার্থে এবং তন্ত্র স্থাপনের মহান উদ্দেশ্যে। আজও, সেই তুর্কী শিল্পীর ভারত আগমনের প্রায় চারশত বৎসর পরেও দেখা যায়, শাল তন্তুবায় সম্প্রদায়ের নতুন কোনও সদস্য নিজ কার্য প্রারম্ভে এই পথিকৃৎ শিল্পীর কবরস্থলে পুষ্পাঞ্জলি করিয়া থাকেন।

এক বিশেষ বন্য ছাগজাতি (Capra Hircus) — যাহাদের চারণক্ষেত্র প্রধানত তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার উপত্যকায় সীমিত, তাহারাই এই শাল নির্মাতাদের প্রধান উপজীব্য। ঘন রোমবিশিষ্ট এই ছাগজাতির স্বীয় দীর্ঘ, রুক্ষ, ঘন রোমাবরণ ব্যতীত শীতকালে ইহাদের শরীরের নিম্নভাগে, বিশেষত উদরস্থলে, প্রাকৃতিক নিয়মে একপ্রকার সূক্ষ্ম নূতনতর রোমরাজির সৃষ্টি হয়— পর্বত উপত্যকার প্রবল শীতে এই সাময়িক রোমাবরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, বসন্ত সমাগমে শীত অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই পশুগণ পর্বতগাত্রের রুক্ষ প্রস্তরাদিতে নতুবা ঘন গুল্মগাছের সঙ্গে গাত্রঘর্ষণ করিয়া এই সূক্ষ্ম রোমাবরণ ধীরে ধীরে বর্জন করিয়া ফেলে।



ফরাসি ফ্যাশন পোস্টার-এ কাশ্মীরি শাল



এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ এই সদ্য পরিত্যক্ত রোম সংগ্রহ করিয়া একত্রিত করেন।

"ইহা এক অতীব মনোহর দৃশ্য। আমার কয়েকজন পর্যটক বন্ধু যাহারা ছাগচর্ম নিঃসৃত এই রোমশস্যসম্ভার (fleece harvest) প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; ভ্রমবশত, এ ধারণাও পোষণ করিয়াছেন যে শাল নির্মাণার্থে ব্যবহৃত বস্তু প্রকৃতপক্ষে কাপাসকুণ্ডলী, তুলাবৃক্ষ হইতে আহরিত। এই অপর্যাপ্ত শুভ্র, কোমল সম্ভার কোনও পশুগাত্র হইতে সংগ্রহ করা অসম্ভব।...

কাশ্মীরের অন্যান্য অঞ্চলে গৃহপোষ্য ছাগজাতির গাত্র হইতে চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া এই রোম সংগ্রহ করা হয়। কাশ্মীরি সুন্দরীগণ বিভিন্ন দূরাঞ্চল হইতে এই ছাগরোম সংগ্রহ করিয়া আনেন। অরণ্যছাগের রোম স্বভাবতই দুষ্প্রাপ্য ও শাল নির্মাণের মূল উপাদান হিসাবে অত্যন্ত মহার্ঘ— ইহা হইতে সূক্ষ্মতম শাল নির্মাণ সম্ভব।"

Carl Von Hugel-ëKaschmir und das Reich der Siekí,1836

প্রথমাবস্থায় এই শাল তুষারশুভ্র—" অবশ্য ইদানীং দেখিতেছি কেহ কেহ এই বস্ত্রখণ্ড নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাকেন। গৃহপালিত পশুর রোম সাধারণত ধূসর বা মলিণ বর্ণ, ফলে তন্তুতে সূক্ষ্ম সূত্রাবলী হিসাবে প্রস্তুত করিবার পূর্বে স্বাভাবিকভাবেই তাহাতে বর্ণসংযোগ করিয়া লইতে হয়।"

শাল নির্মাণের কয়েকটি পর্যায়ভাগ ছিল এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষ একেক জন একেক পর্যায়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতেন। যিনি শালের নক্সাচিত্র প্রস্তুত করিতেন, তাহাকে বলা হইত নকাস। যিনি নকাস কর্তৃক প্রস্তুত চিত্রলিপি সহযোগে তন্তুর বর্ণবিভাজন নির্দেশ তৈয়ারি করিতেন, তিনি তারাহ গুরু বলিয়া অভিহিত হইতেন। তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন তালিম গুরু, যিনি এই সমস্ত নির্দেশ এক সাঙ্কেতিক বর্ণমালায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন।



তন্তুর দীর্ঘকালীন টানাপোড়েনে সদ্যোনির্মিত শালটি বেশ কয়েকটি স্থানে ছিদ্রকলঙ্কিত হইত। সেইহেতু রফুগর নামক নূতন সূচীশিল্পী সম্প্রদায়ের জন্ম হইল। 'রফু' শব্দের পারস্য অর্থ 'অদৃশ্য'। অতএব, যিনি ছিদ্রকে সূক্ষ্ম সেলাইপূর্বক অদৃশ্য করিয়া দেন, তিনিই রফুগর। এই রফুগর সম্প্রদায় এক অত্যাশ্চর্য শিল্পীগোষ্ঠী। কিন্তু বেদনার কথা এই যে দীর্ঘদিন ধরিয়া এই সূক্ষ্ম সূচীকর্ম করিবার ফলে অধিকাংশ রফুগরেরাই কয়েকদিনের মধ্যেই হয় আংশিক নতুবা সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিশক্তি ক্ষমতা রহিত হইয়া পড়িতেন।

কাশ্মীরি শালের কোমলতার কৃতিত্ব কেবলমাত্র এই বিশেষ ছাগরোমের নহে। কাশ্মীর অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, তাহার জলবায়ু, এইক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের দাবি রাখে। শালটি তৈয়ারি হইলে পর্বতগাত্রে চুনাপাথর ক্ষারিত শীর্ণ প্রস্রবণ ধারায় এই শালটিকে বহুক্ষণ আর্দ্র করিয়া রাখা হইত। এবং সময়ে সময়ে অতি সাবধানে পর্বতগাত্রে জলসিঞ্চিত শালটিকে ধীরে ধীরে মর্দন করিলে তাহাকে নমনীয় করা হইত।

(২)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অবধি দীর্ঘ শালের প্রচলন দেখা যায়। এই শালগুলি দুই প্রান্তে পাইন পত্র ও পুষ্পশোভিত পাড়ের দ্বারা অলঙ্কৃত হইত। কাশ্মীরি তন্তুবায়রা ডোরাকাটা শাল এবং চৌখুপি শালও বুনিতেন— প্রধানত তুর্কীস্তান বা পারস্যে বিক্রয়ের জন্য। পাশ্চাত্ত্যে তখনও কাশ্মীরি শালের কদর যথার্থভাবে তৈয়ারি হয় নাই।

ইওরোপীয় ভূখণ্ড হইতে যে জাতি প্রথম এই অনবদ্য কাশ্মীরি বস্ত্ররূপটির সঠিক মূল্যায়ন করেন, তাহারা নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যপোত এই প্রকার কিছু কাশ্মীরি শালের নমুনা ইংলন্ডে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। ইংলন্ডের রমণীগণ দেখিলেন, এই ভারতীয়



পোশাক তাঁহাদের বেশসৌকর্যে এক অভিনব কমনীয়তা দান কতিছে।

ফরাসী দেশের রমণীগণের বেশভূষায় তখন অস্থিনির্মিত একপ্রকার কটিবেষ্টনীর (Whalebone corset) প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। তাঁহারা ব্রিটিশ মহিলাদের কমনীয়তার জাদুতে বিস্মিত হইলেন। কিন্তু, ফরাসি দেশে কাশ্মীরি শালের তেমন প্রচলন হইল না।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে Jacques-Louis David অঙ্কিত ফ্রান্সের এক অভিজাত মহিলা Marquise de Sorcy de Thelusson-র প্রতিকৃতি বোধ করি ফরাসি পোশাকে প্রাচ্যপ্রেমের প্রথম প্রমাণযোগ্য নিদর্শন। অন্যান্য যে চিত্রকররা ফরাসি দেশে কাশ্মীরি শালের নিদর্শন তাঁহাদের চিত্রকর্মে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন Jean-Auguste-Dominique Ingres। উপরিউক্ত Dominique ১৭৯৭ বা ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে (সঠিক সময় লইয়া শিল্প গবেষকদের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে সংশয় আছে) Barbara Bansi নাম্নী এক তরুণী চিত্রশিল্পীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। চিত্রে তাঁহার এক হস্তে বিধৃত একটি টেলিস্কোপ, অন্য হস্তে অতি সূক্ষ্ম পাইনসারির সরল নকশায় শোভিত একটি কাশ্মীরি শাল। তবে এই সকল বর্ণনা দু'একটি বিক্ষিপ্ত উদাহরণ মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে, ফরাসি দেশে কাশ্মীরি শাল প্রবেশ করে অত্যন্ত রাজকীয়ভাবে। সম্রাট নেপোলিয়ন তখন মিশরবিজয় সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। সমরতূর্যনিনাদে সেই ফরাসি বীর এবং তার সৈন্যদলকে অভিবাদন জানানো হইল। যে বিরহিণী প্রিয়ারা তাঁহাদের যুদ্ধক্লান্ত প্রেমিক বা দয়িতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্যে জুটিল এক একটি অপূর্ব উপহার। শোনা যায়, নেপোলিয়নের সেনানীদলের অধিকাংশ সদস্যই যুদ্ধশেষে ফ্রান্সে ফিরিবার পথে তাঁহাদের প্রিয়ার জন্য উপহারস্বরূপ আনিয়াছিলেন এক একটি কাশ্মীরি শাল।

ফ্রান্সের অভিজাত সমাজ মুহূর্তের মধ্যে প্রাচ্যদেশীয় এই উষ্ণতার আবরণকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিল। পুষ্প, কল্কা শোভিত এই কোমল বস্ত্রখণ্ড ফরাসি সুন্দরীদের নিরাভরণ পোশাককে এক অনির্বচনীয় সুষমায় মণ্ডিত করিল। ফরাসি রমণীরা প্রাচ্যের এই প্রেমিককে দেহলগ্ন করিয়া গ্রহণ করিলেন। শালের আবরণের অন্তরালে তাঁহাদের অঙ্গ সঞ্চালন অতীব মনোহর দেখাইল। এবং এই শাল সুন্দরীদের সম্মিলিত নৃত্যশোভার নূতন নামকরণ হইল 'দ্যু শল' (u schall)।

Comtesse de Boigne তাঁহা স্মৃতিচারণায় বলিয়াছেন জনৈকা সুন্দরী লেডি হ্যামিলটনের কথা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই সুন্দরী তরুণী তাঁহার বৃহৎ সুসজ্জিত বৈঠকখানায় কাশ্মীরি শাল সহকারে নানাবিধ গৃহসজ্জার আয়োজন করিতেন। "সেই কক্ষে থাকিত সুদর্শন বৃহৎ ফুলদানি, ধূপদানি, বীণা ও তম্বুরা। লেডি হ্যামিলটন সমস্ত বাদ্যযন্ত্র সহযোগে দেবী অ্যাথেনার ন্যায় কক্ষের মধ্যভাগে উপবিষ্টা হইতেন। একটি কাশ্মীরি শাল তাঁহার মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ভূমি স্পর্শ করিত। তারপর শুরু হইত তাঁহার অদ্ভুত মায়াবী শাল সঞ্চালনের জাদুকরী দক্ষতা। একটি শাল কখনও তাঁহার গণ্ডদেশকে আবেষ্টিত করিত। কখনও শালের ঘেরাটোপের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত তাঁহার বিলোল পিঙ্গলকটাক্ষ। ধূপের ধোঁয়ায়, বাদ্যযন্ত্রের মূর্চ্ছনায় সেই কক্ষ যেন এক আশ্চর্য মায়াময় পৃথিবীতে পরিণত হইত।"



ফরাসি দেশে তখন কাশ্মীরি শালের প্রচলন যেন পাইনবনে দাবানলের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। নেপোলিয়নের প্রেমিকা ফ্রান্সের হবু সাম্রাজ্ঞী জোসেফিন বোনাপার্টের অনুকরণে প্যারিসের সমস্ত অভিজাত রমণী অন্তত একখানি, সম্ভব হইলে তাহার অধিক, শালের অধিকারিণী হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে Baron Gros, জোসেফিনের একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। চিনে জোসেফিন পরিহিত পোশাকটি একখানি কাশ্মীরি শুভ্র শাল হইতে নির্মিত। তাঁহার গাউনের তলদেশে পাইন নক্সা, সুদৃশ্য পাড়। অন্য একটি রক্তবর্ণ কাশ্মীরি শাল জোসেফিনের কটিদেশ হইতে ভূলুণ্ঠিত। এই রক্তিম শালের অন্য প্রান্তটি তাঁহার বাম স্কন্ধের উপর দিয়া শাড়ির অঞ্চলের মতো পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। গবেষকরা বলিয়াছেন, জোসেফিনের সংগ্রহে অন্তত ষাটটি কাশ্মীরি শাল ছিল। তাঁহার কয়েকটি আটহাজার থেকে বারো হাজার ফ্রাঁ মূল্যের। সেই সময়ের রাজকোষাগারের অনুপাতেও বর্ণনাতীত অধিক এই অর্থপরিমাণ।

(৩)

কাশ্মীরি শাল এত মূল্যবান হইলেও তাহার চাহিদার কোনও অন্ত ছিল না এবং পাশ্চাত্যে এই নিরন্তর চাহিদার সঙ্গে তাল রাখিতে গিয়া কাশ্মীরি শাল নির্মাতাদের নিত্যনব নির্মাণ পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে হইতেছিল। আনুমানিক এই সময় হইতেই শালে সূচীশিল্পের





ফরাসি ফ্যাশন ড্রয়িং। সেই সময়ে

প্রবর্তন হয়। বয়নকালে তন্তুতে নক্সা নির্মিত করিবার পরিবর্তে সূচীশিল্পীগণ তাহাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য করিয়া শালগুলিকে অতীব মনোহর করিয়া তুলিতে লাগিলেন। বয়নশিল্পের নক্সা অপেক্ষা এই সূচীশিল্প তিন গুণ বেশী সময় ধরিয়া রচিত হইত। কাশ্মীরি শালের শব্দকোষে নূতন দুইটি নাম সংযোজিত হইল। নক্সা বোনা শালের নাম 'কান্নিকার'। আর সূচীশিল্প বা এমব্রয়ডারি শোভিত শালগুলিকে বলা হইতে লাগিল 'আমলিকার।' ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের পর কাশ্মীরি শাল নির্মাতারা এক মধ্যবর্তী উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। শালের চারদিকে পাড়,পাড়ের নক্সা তন্তুতে বোনা হইত। তারপর সূচীশিল্পীগণ সেই দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ডের চারিটি কোণে এমব্রয়ডারি করিয়া নক্সা করিয়া দিত।

প্রতীচ্যে কাশ্মীরি শাল ধীরে ধীরে বিবাহের উপঢৌকন হিসাবে এক আনুষ্ঠানিক মর্যাদা লাভ করিল। ভাবী স্ত্রীকে শৌখিন লেস ও দুর্মূল্য অলঙ্কারের সহিত কাশ্মীরি শাল উপহার দেওয়া এক অভিজাত রীতিতে পরিণত হইল। ক্রমে এই রীতি এক সংস্কারে পর্যবসিত হইল। কেবল বিবাহিত মহিলারাই শাল পরিধানের গৌরবের অধিকারিণী হইলেন। কুমারী রমণীর জন্য কাশ্মীরি শালের ব্যবহার সামাজিকভাবে অশোভনীয় মনে হইত।

নেপোলিয়ন তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী মারি লুইসকে বিবাহের প্রীতি উপহার হিসাবে সতেরোটি কাশ্মীরি শাল প্রেরণ করিয়াছিলেন। লুভ্র (Louvre) মিউজিয়ামে সংরক্ষিত Benjamin Zix-এর একটি জলরঙা ছবিতে আমরা এর বিশদ বর্ণনা পাই। ১৮১০ সালে এই সাড়ম্বর বিবাহ উৎসবে রাজ দম্পতির সঙ্গে বহু অভিজাত রমণী, তাঁহাদের কোমল হস্তশোভা, কাশ্মীরি শালের সাহায্যে কোমলতর করিয়াছিলেন।

(৪)

এত দুর্মূল্য হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপে কাশ্মীরি শালের চাহিদা ক্রমবর্ধমান হইল। ব্রিটেন এবং ফরাসী দেশের বস্ত্র নির্মাতারা ইহার অনুকৃতি নির্মাণ করিবার বহু প্রচেষ্টা করিলেন। কিন্তু কাশ্মীরি শালের মৌলিক উৎকর্ষ পাশ্চাত্যের কারিগরদের কাছে অধরা রহিয়া গেল।

পার্বত্য ছাগের উদর রোমের পরিবর্তে অধিকাংশ সময়ে ইউরোপীয় কারিগরগণ রেশম সূতা ব্যবহার করিত। তাহাতে কাশ্মীরি শালের স্বভাবজ ওজন আর পশমের কমনীয়তা কোনও কিছুতেই নবনির্মিত হইল না। প্রথম দিকের সামান্য কয়েকটি দুর্বল অনুকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ অবধি ইউরোপ জুড়িয়া কাশ্মীরি নকশায় শাল বুনিবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা চলিল।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট নেপোলিয়ন 'মহাদেশীয় অবরোধ' (Continental Blockade) ঘোষণা করিলেন। ইহার ফলে, ব্রিটিশ বাণিজ্যেপোত ফ্রান্স-সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রবেশ করিতে পারিল না। প্রত্যক্ষভাবে, ইহাতে ফরাসী রেশম শিল্পের এক অকস্মাৎ উন্নতি ঘটিল। কাশ্মীরি শাল ফ্রান্সে পৌঁছাইবার সহজ রাস্তা বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, হয় কোনও গোপন উপায়ে নতুবা রাশিয়ার মধ্য দিয়া এক জটিল ঘুরপথে আমদানি করা সম্ভব হইল। ইহাতে বর্ধিত করের দরুন কাশ্মীরি শাল আরও বেশী দুর্মূল্য হইল এবং ঘুরপথের কারণে তাহার ফ্রান্সে পৌঁছিতে অধিকতর বিলম্ব হইত। ফরাসি সুন্দরীরা কাশ্মীরি শালের মাদকতায় এমন গভীরভাবে আসক্ত ছিলেন যে এই বিরহ তাঁহাদের পক্ষে সুখকর হইল না। ফরাসি দেশে ফরাসি নক্সায় শাল নির্মাণ শুরু হইল।

১৮১২-র ৩১ শে ডিসেম্বর বর্ষবিদায়ের উপঢৌকন হিসাবে নেপোলিয়নের দ্বিতীয় স্ত্রী সম্রাজ্ঞী মারি লুইসকে বারোখানি শাল দেওয়া হইল। Moniteur Universal, ১৮১৩ ফেব্রুয়ারি ১-এ রচিত এক নিবন্ধে দেখিতে পাই, "আমাদের শিল্পীরা যে নূতন নক্সা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা ওই বন্যদেশের জবরজং নক্সা হইতে নিঃসন্দেহে অনেক বেশি শিল্পসম্মত। সেই বৈচিত্র্যহীন পাইন পাতার সারির বদলে ইওরোপের নিজস্ব পুষ্পস্তবক এই নক্সায় উপস্থিত হইয়া অনেক বেশী নয়নমনোহর হইয়াছে।"

কিন্তু কাশ্মীরি শালের সহিত এই প্রতিযোগিতা সাময়িকভাবে সফল হইলেও দীর্ঘস্থায়ী হইল না। ধীরে ধীরে প্রকৃত কাশ্মীরি শালবিলাসীগণ মৌলিক এবং এই নবনির্মিত শালের পার্থক্য সম্যকভাবে অনুধাবন করিতে লাগিলেন। অভিজ্ঞ 'রফুগর'-এর অভাবে শালের কোনও ছিদ্র অদৃশ্যভাবে মেরামত করিবার আর কেহ রহিল না। ফলে এই ফরাসি অনুকরণ শালের সাম্রাজ্যে স্বীয় গৌরবময় স্থান প্রতিষ্ঠা করিতে অক্ষম হইল।...

লেখাটি এর বেশি আর এগোয়নি।
পাণ্ডুলিপিতে কোনও নাম দেওয়া ছিল না।
শিরোনামটি রোববার থেকে দেওয়া।

পরমনরম পুবপশ্চিমে



পশ্চিমী পণ্ডিতেরা ভুরি ভুরি লিখে জগৎজুড়ে জনপ্রিয় করেছেন কাশ্মীরি শালকে।
তাঁদের হাতে কাশ্মীরি শাল পেয়েছে এক নতুন আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা। এমনকি নামের বানান
পাল্টে হয়েছে ক্যাশময়্যর (Cashmere)। কোনটা তবে ঠিক? পাশ্চাত্য বিশ্লেষণ না ভারতীয় আখ্যান?
কী দিয়ে বিচার করব কাশ্মীরি শালের প্রকৃত রূপ?
বিশ্লেষণ করলেন বিশিষ্ট শিল্পী, চলচ্চিত্রকার এবং বসনবিদ **মুজাফ্ফর আলি**

ভারতবর্ষের মানচিত্রে কাশ্মীর চিরকালই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। স্বাধীনতার পর থেকে তার ভৌগোলিক অবস্থান অমোঘভাবে নির্ধারিত করেছে এই উপমহাদেশের শান্তি যুদ্ধের সহাবস্থান। পর্যটকদের ভূস্বর্গ একসময় ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে আতঙ্কবাদীদের অবাধ মৃগয়াক্ষেত্র। কাশ্মীরের হ্রদ-দূষণ সারা ভারতের পরিবেশবিদের গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করিয়েছে।

বারুদ এবং বুলেটের সাম্প্রতিক দুঃস্বপ্নের কথা বাদ দিলে কাশ্মীরকে আমরা বরাবরই চিনে এসেছি তার চেনারগাছ, আখরোট কাঠের সামগ্রী এবং অবিসংবাদিতভাবে কাশ্মীরি শাল নিয়ে।

কাশ্মীরি শাল কেবলমাত্র একটি পোশাক বা শিল্পসামগ্রী নয়। পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করে যে কটি 'আইকন', তার মধ্যেও অন্যতম শাল নামক শীতকালীন এই অঙ্গবস্ত্র।

গোড়ার কথা দেখতে গেলে এই কাশ্মীরেই ফিরে আসতে হয়। আজ থেকে প্রায় চার পাঁচশো বছর আগে, যখন প্রথম এই শাল নির্মাণের সূত্রপাত হয় তখন। ভৌগোলিক কারণে শাল কাশ্মীরে বা তার নিকটবর্তী স্থান ছাড়া নির্মিত হওয়া সম্ভব ছিল না। জম্মু অঞ্চলের পাহাড়ি উপত্যকায় এক বিশেষ ধরনের বন্য ছাগলের মরসুমি লোম থেকে শাল বোনার শুরু। তখন পাহাড়ি অঞ্চলে যানবাহন বা যাতায়াত ব্যবস্থা সীমিত ছিল বলে কাশ্মীর অঞ্চলের অধিবাসীরাই এই বিশেষ পশুজ উপাদানটির সুযোগ-সুবিধা পেতেন—ভারতবর্ষের অন্য মানুষের কাছে যা সহজসাধ্য ছিল না। এই ভৌগোলিক পটভূমিকায় যে শিল্পবস্তুটির জন্ম হল আন্তর্জাতিকভাবে সেটি কাশ্মীরি শাল বলে বিখ্যাত।

কাশ্মীরি শাল বলতে পুঁথিগতভাবে যে বিশেষ বস্ত্র, বিশেষ নক্শা, বিশেষ বয়নশিল্প বোঝা যায়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা পাল্টাতে লাগল। এখন বোধহয় পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে অমৃতসর আর লুধিয়ানায় সব থেকে বেশি কাশ্মীরি শাল তৈরি হয়। বিশ্বায়নের যুগে হয়তো এটাই অবধারিত ছিল। লখনউয়ের চিকনকারি এখন কলকাতার মেটিয়াব্রুজে পাওয়া যায়, অওয়াধের বিশেষ বিরিয়ানি ভারতবর্ষের যে কোনও রেস্তোরাঁয় অত্যন্ত সহজলভ্য। অতএব পাঞ্জাব প্রদেশে তৈরি কাশ্মীরি শালকে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা রাখে এমন বিশুদ্ধতাবাদী এ দেশে বড় একটা আছে বলে মনে হয় না।

ভারতবর্ষের জীবন্ত শিল্পবস্তুগুলির মধ্যে কাশ্মীরি শাল প্রায় প্রাচীনতম, যার ফলে এর বিবর্তনের ইতিহাসে মিলে গেছে প্রচুর লোক কথা, রোমান্টিক আখ্যান এবং কল্পনার কিংবদন্তি। কিন্তু, সত্যি যদি এ বিরাট বিবর্তনের কাহিনীর মধ্যে থেকে আমরা ইতিহাসের সারটুকু ছেঁকে বার করতে চাই, তা হলে—কোনটিকে প্রামাণ্য বলে মানব?

প্রথমেই ধরা যাক, কাশ্মীরি শালের জন্ম ইতিহাস। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধারণা, মধ্যযুগের মুসলমান-সুলতান জাইন উল আবিদিনই কাশ্মীরি শালের প্রবর্তক। এই ধারার মত অনুযায়ী জাইন-উল-আবিদিন যখন সামারকন্দে তৈমুরলঙ্গের বিজিত বন্দি হিসাবে দিন কাটাচ্ছেন, তখনই তাঁর এই বস্ত্রশিল্পের উৎকর্ষের সঙ্গে পরিচয় হয়। সেই বন্দিদশায় দেখা শাল ও গালিচা তাঁর মনে নাকি এতটাই গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যে ১৪০৫ সালে তৈমুরের মৃত্যুর পর জাইন-উল-আবিদিন যখন মুক্তি পান কাশ্মীরে ফিরে এসে তুর্কিস্তান থেকে অভিজ্ঞ শাল এবং গালিচা কারিগরদের আমন্ত্রণ করে কাশ্মীরে এনে ভারতবর্ষে এই শিল্পের প্রবর্তন করেন।

শালের ইতিহাস একটু খুঁটিয়ে দেখলে এই ঘটনার সততা সম্বন্ধে সমূহ সন্দেহ দেখা দেয়। ঐতিহাসিকভাবে তৈমুর যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সেটা ১৩৯৮ সাল। জাইন-উল-আবিদিনের তখন জন্মই হয়নি, তৈমুরের সঙ্গে যুদ্ধ এবং বন্দি হওয়া তো দূরের কথা। প্রতিবেশী হিন্দু অধ্যুষিত জম্মু উপত্যকায় সুলতান সাত বছরের স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলেন। তারপর ১৪২০ থেকে ১৪৭০ (মতান্তরে ১৪২২ থেকে ১৪৭২) অবধি তাঁর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের শান্তিপূর্ণ রাজ্য শাসনকালে কাশ্মীর উপত্যকায় শিল্পোৎকর্ষের উন্নতি ঘটেছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই সময়টি শাল নির্মাণের জন্মলগ্ন বলে কোনওভাবে চিহ্নিত হতে পারে না।

সুলতান জাইন-উল-আবিদিনের এই কাহিনীর প্রথম বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ঘটেছিল এক অস্ট্রিয়া দেশীয় ব্যারনের কলমে। তাঁর নাম কার্ল ভন হিউগেল। তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। ১৮৪০ সালে রচিত তাঁর কাশ্মীর ভ্রমণ বর্ণনার বই Kaschmir und das Reich der siek-এ এই আখ্যানটির উল্লেখ আছে। হিউগেল দাবি করেছেন তিনি এই তথ্য পেয়েছেন কলহন-এর **রাজতরঙ্গিনী** এবং অন্যান্য সমসাময়িক লেখকের বিভিন্ন বর্ণনায়। তিনি যে লেখকদের কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রীবর।

শ্রীবরের লেখায় দেখা যাচ্ছে, জাইন-উল-আবিদিনের রাজত্বে 'বহু দূর দেশ' থেকে শিল্পী এবং কারিগররা এসেছেন কাশ্মীরে রাজসভায়, এবং তাদের কাছেই কাশ্মীরের মানুষ এই পাইনলতার নকশা প্রথম অধ্যয়ন করেন। পাহাড়ে ঘেরা ছোট রাজ্য কাশ্মীরের রাজ



সভাকবি শ্রীবরের কাছে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ এক বড় দূরের দেশ। এমনকী, পাহাড়ের উপর দিকে জম্মু রাজ্যকেও শ্রীবর তার একটি উক্তিতে বিদেশ বলে অভিহিত করেছেন।

হিউগেল সেই খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়ে এই দূরদেশ শব্দটির অর্থ করলেন পারস্য বা তুর্কিস্থান যার সরাসরি উল্লেখ তখনকার কোনও ভারতীয় রচনায় পাওয়া যাচ্ছে না। ভারতীয় শব্দ ব্যবহারে এই কাব্যিক বিশালতা একজন ইউরোপীয় ব্যারনের বুঝতে পারার কথা নয়। কারণ, ভারতবর্ষের দর্শন তথ্য বা বর্ণনা দেয় না, দেয় অভিজ্ঞতা। আর ইউরোপীয় আখ্যান দাঁড়িয়ে থাকে বর্ণনার সঠিক তথ্য-তালিকার উপর।

কাশ্মীরি শাল বয়ন শিল্প নিয়েও অনেক অকারণ জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র পর্বত রাজ্যের মানুষরা তাঁদের অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিক অনুযায়ী অত্যন্ত সহজ প্রকৃতি উদ্ভূত কতগুলি পদ্ধতি তৈরি করে নিয়েছিলেন। যার সারল্য এবং সঠিক রূপটি অনুধাবন না করতে পেরে পাশ্চাত্য বর্ণনাকাররা একে অহেতুক রহস্যময় করে তুলেছেন। পাশ্চাত্য বর্ণনায় যা ধরা পড়ে না তাই অলীক এবং দুর্বোধ্য, তা ভারতবর্ষের যোগ সাধনাই হোক বা যৌথ পরিবার-ই হোক।

এ-কথা ভুললে চলবে না ইউরোপে যখন শিল্পবিপ্লব ঘটে গিয়েছে তখন কাশ্মীরি তাঁতিরা কীভাবে একটা পশমের বস্ত্রখণ্ড নিতান্ত দেশজ পদ্ধতিতে তৈরি করছেন এবং পশ্চিমি কারিগরদের পক্ষে সমস্ত প্রযুক্তি সত্ত্বেও তার সঠিক অনুকৃতি নির্মাণ করতে অসুবিধা হচ্ছে। তখন নিজেদের এই ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্য একটি পদ্ধতিকে দুরূহ বা জটিল বলে দেওয়া খুব সোজা।

কাশ্মীরি শাল সম্পর্কে তৃতীয় বিতর্কের জায়গাটি হচ্ছে পশমিনা এবং তুস। পাশ্চাত্য ধারায় সাধারণত পশমিনা আর তুসকে এক করে ফেলা হয়। এবং, যা কিছু কাশ্মীরি তাই পশমিনা, বা উল্টোটা— এমন একটা ধারণাও প্রচলিত আছে। যদিও পশমিনা কথাটার মূলে রয়েছে পশম শব্দটি, ভারতীয় অর্থে প্রচলিতভাবে যার মানে হচ্ছে উল। তবুও এ-কথাটি বলে রাখা ভাল ভারতবর্ষের বৈচিত্র্য কোনও একটি শিল্পকে একটি বিশেষ তক্‌মা দিয়ে স্থগিত করে দেয়নি। ফলে লাহোরে তৈরি পশমিনা শাল (আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরিতে যার উল্লেখ আছে) তার সঙ্গে নির্দ্বিধায় রেশম-পশমের সুতো মিলিয়ে তাতে রাজকীয়তা এবং নমনীয়তা এনেছে এবং পশমিনা কোনভাবেই জাতিচ্যুত হয়নি।

যে অরণ্যমেষের লোম থেকে পশমিনা তৈরি হত তার ল্যাটিন নাম **কাকরা আইবেক্স সিবেরিকা**। তুসের জন্ম একধরনের তিব্বতীয় কৃষ্ণসার মৃগ থেকে যার ল্যাটিন নাম **প্যানথালোপস্ হপিজসোনি**, লাদাকি ভাষায় যার নাম **স্তোস** (এখান থেকে তুস শব্দের উদ্ভব) আর তিব্বতি ভাষায় চিরু।

কাশ্মীরি শাল সম্পর্কে প্রামাণ্য দু'জন রচয়িতার তুলনা এখানে অনিবার্য হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্যের জন আরউইন এবং ভারতবর্ষের মতি চন্দ্র। আরউইন ইংরেজি ভাষায় লিখে কাশ্মীরি শাল সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষকে আলোকপ্রাপ্ত করেছেন। এইজন্য নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু, এটা ভুলে গেলে চলবে না আরউইনের যাবতীয় তথ্য প্রমাণের সূত্র বিদেশি পর্যটকদের জার্নাল। যাঁরা না বুঝতেন স্থানীয়



পাশ্চাত্য ধারায় সাধারণত পশমিনা আর তুসকে এক করে ফেলা হয়। এবং, যা কিছু কাশ্মীরি তাই পশমিনা, বা উল্টোটা



মানুষদের ভাষা, না জানতেন ভারতবর্ষের কোনও পুঁথিগত ভাষার সম্ভার! ফলে এই জার্নালগুলিতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে, তা অনেকটাই প্রত্যক্ষ বর্ণনা হলেও এর সঙ্গে অনেকাংশে মিশে রয়েছে তাঁদের নিজস্ব অনুমান এবং ধারণা।

মতি চন্দ্র খাঁটি ভারতীয় লেখক হিসেবে তাঁর প্রমাণাদির উৎস হিসেবে বেছে নিয়েছেন ভারতীয় পুঁথির অন্তর্নিহিত বিশ্লেষণ। তিনি সংস্কৃত, পালি এং হিন্দি ভাষায় পারদর্শী এবং সর্বোপরি তিনি ভারতীয়। ভারতীয় শব্দ প্রয়োগের অক্ষমতা এবং বিশালত্ব সম্পর্কে তিনি সমান ওয়াকিবহাল।

প্রাচ্য বনাম প্রতীচ্যের এই বিতর্ক কোনদিন ফুরোবে না। তৈরি হবে নানান সূত্র, নানান ধারণা, নানান সংশয়, নানা দোলাচল। এবং এই পথের মধ্যে দিয়ে কিছুটা ইতিহাস, কিছুটা লোককথা, কিছুটা ভ্রমণবিলাসির আখ্যান সম্বল করে এগিয়ে যাবে কাশ্মীরি শাল পৃথিবীর সভ্যতার পথ ধরে। ঠিক যেমন, আজ এক নিরন্তর দোদুল্যমান সংশয়ের মধ্যে দিয়ে প্রতিটি দুঃস্বপ্নের সূর্যাস্তকে বিদায় দিয়ে আবার নতুন করে প্রতিটি শঙ্কাকুল সূর্যোদয় দেখছে শালের আদি মাতৃভূমি কাশ্মীর।

বাংলা অনুবাদ ঋতুপর্ণ ঘোষ

তামাম শাল

পশমিনা পশম একটি পার্সি শব্দ। ছাগের নরম আঁচড়ানো লোম দিয়ে তৈরি হয় পশম। লাদাক, টিবেট, ইয়ারকান্তে পশম পাওয়া যায়। পশমিনা শাল বোনার নিপুণতা কাশ্মীরিদের একচেটিয়া। সেই কারণেই পশমিনা মানেই কাশ্মীর। পশ্চিমে নামান্তরে একে **ক্যাশমেয়্যর** বলা হয়। যুগ-যুগান্ত ধরে এই শাল তাই অদ্বিতীয়।

তুস শালের রাজা হল তুস। হরিণ জাতীয় প্রাণী চিরুর লোম দিয়েই মূলত এই শাল তৈরি হয়।

শাহ-তুস দুটি কথার সমন্বয়। শাহ, অর্থাৎ রাজা, তুস অর্থাৎ উল। সুতরাং বলা যেতেই পারে রাজাদের একরকমের পোশাকের রকম এই তুস। নরম সিল্কের আঁশ যা সাধারণ পশমের মতো হাল্কা আর নরম তাই দিয়ে তৈরি হয় তুষ। বর্তমানে বিপদগ্রস্ত চিরু জাতিকে বাঁচাতে তুস নিষিদ্ধ।

জামেওয়ার লম্বা আকৃতির শাল বা শালবস্ত্রকে জামেওয়ার বলে। তাঁতে বোনা এই অঙ্গবস্ত্রে রয়েছে নানাধরনের মুগ্ধ করা নকশার প্রদর্শন। জামেওয়ার দিয়ে চোগা, আচকান, শেরওয়ানি, জ্যাকেট বানানো হয়।

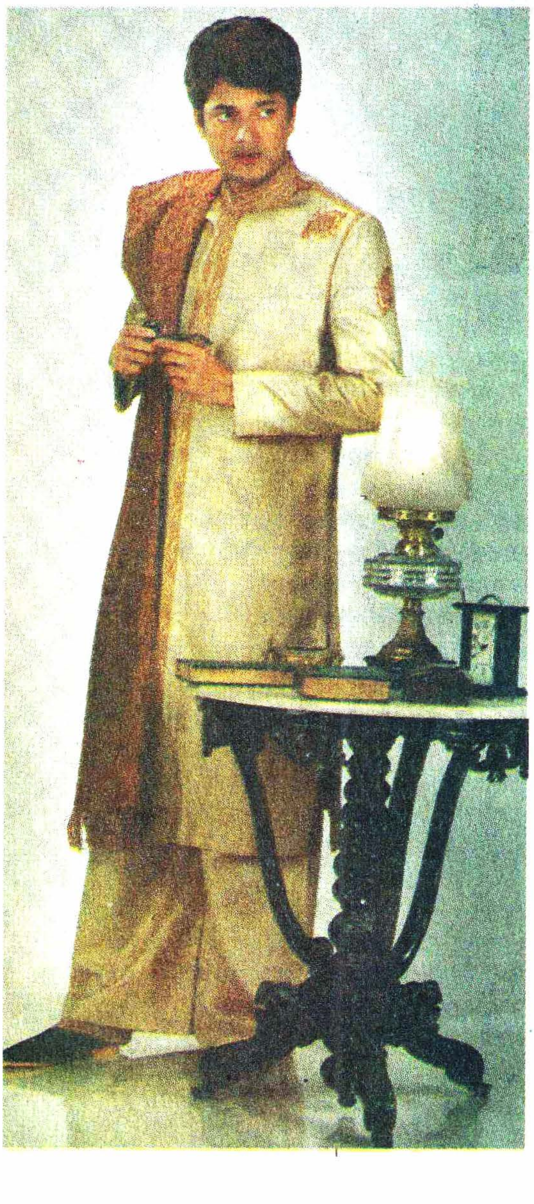
ইতিহাস বলে যে, প্রারম্ভিক সময় জামেওয়ারকে একরকম বিশেষ উলের কারিগরি বলা হত যা আফগান ও পারস্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এর খ্যাতি ধীরে ধীরে এত বাড়তে থাকে যে তাঁতিরা পাড় ছাড়া লম্বা ফুল তোলা শালগুলিকেও জামেওয়ার বলে চালাতে থাকে। জামেওয়ারের প্রধান আকর্ষণ ফুল-তোলা মূল নক্সা।

দো-শালা আকবর-ই মোহর-এ যেমন সম্রাট আকবরের নিজস্ব রাজন্যছায়া তেমনই আকবর আবিষ্কৃত শালেও রয়েছে সেই রাজ-আভিজাত্যের ছোঁয়া।

সম্রাট আকবরের পরিকল্পনাতেই প্রথম বানানো হয় দো-শালা। দুটি পূর্ণাঙ্গ শাল একে অপরের ওপরে জুড়ে দেওয়া, যাতে ভেতরের আঁশটি আদৌ দৃশ্যমান না হয়। শাল-এর বড় ভক্ত ছিলেন সম্রাট আকবর। তিনি এর নতুন নামকরণ করেন **পরমনরম**।

শালপ্রাংশু

রাত্রে ইংরেজি বর্ষবরণ, গাত্রে বঙ্গীয় অঙ্গাবরণ।
ঠাকুরবাড়ি থেকে শিশির ভাদুড়ি-শাল জড়ানোর আভিজাত্যের দীর্ঘ আখ্যান। সেই সাজ-পুরুষদের কথা শোনালেন **শর্বরী দত্ত**



শাল বলতে আমি মূলত পুরুষের অঙ্গাবরণ বুঝি। যাকে আমরা কাশ্মীরি শাল বলি। পশমিজমির এই মহার্ঘ বস্ত্রখণ্ডটি খুবই যত্ন সহকারে হাতে বোনা, একে 'কান্নি' পদ্ধতি বলে। বহুমূল্য শালগুলির মধ্যে সবচেয়ে নামকরা—**পশমিনা, জামেওয়ার** এবং **শাহতুস**। পশমিনা শাল তার উষ্ণতা আর কমনীয়তার জন্য বিখ্যাত। জামেওয়ার শালের জমি সর্বাঙ্গে সূক্ষ্ম কারুকাজে একটি অনবদ্য আস্তরণ সৃষ্টি করে—যা আজ বিরল। শুধুমাত্র পুরনো ব্যক্তিগত সংগ্রহেই এর দেখা মেলে।
শালগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছুঁচের কাজে কীর্ণ এক অলংকরণ—কী তার রঙের বিন্যাস আর সুদক্ষ ফোঁড়—হাতের কাজ বলেই বিশ্বাস হয় না!

এইসব শালের প্যাটার্ন এবং মোটিফগুলির বিষয় লতাপাতা, গাছ, ফুল, আম, কল্কা, বাদাম, চেরি, আপেল। ঠাণ্ডায় শরীরের ওম্ রাখতে এই শালগুলির জুড়ি নেই। এর আরাম আর শোভা সে যুগে মেমসাহেবদেরও মনোহরণ করেছিল। ফরাসি, ইংরেজ, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ অভিজাত রমণীরা তাদের ফ্যাশনে কাশ্মীরি শালের আলিঙ্গনে তৃপ্ত ছিলেন। সেই সময় থেকেই স্কটল্যান্ডে প্রথম আম বা আম্বি (কল্কা) মোটিফের ইংরেজি শব্দ Paisley বা **প্যেজলে** নামকরণ হয়। শাহ-তুসের অহংকার তার পেলবতা, উষ্ণতা আর কোমলতার জন্য। এটি হিমালয়ের চিরু হরিণের লোমে তৈরি। এর বিশেষ তন্তুগুলি একে করেছে অবিশ্বাস্য লঘুভার। দুঃখ বা সুখের বিষয়, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কারণে এর তৈরি ও ব্যবহার এখন নিষিদ্ধ।

আরও এক ধরনের শাল আছে যার উল্টো সোজা বলে কিছু নেই। এর উভয় দিকেই বিস্তীর্ণ ছুঁচের কাজ। এই নিপুণতা বেশ বিরল এবং মহার্ঘ। এর নাম **দো-রোখা শাল**।

জামেওয়ার শালের কথা আরেকটু আছে। এই শাল সেকালে রাজারাজড়া খুব ব্যবহার করতেন। আমি একবার হায়দরাবাদে নিজামের সংগ্রহের শালগুলির বিপুল সংখ্যা ও সৌন্দর্য দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। এই সব শালগুলি বেশিটাই ছিল জরির কাজে ভরা। এর শৈলীটির নাম 'জরদৌসি'। এই শিল্পটিকে আমরা 'তুঘলকি' আখ্যা দিতেই পারি কারণ এটি মহম্মদ বিনের সময়েই প্রচলিত হয়েছিল। জরদৌসি শালগুলিতে শুধু যে খাঁটি সোনালি রূপালি তারে এমব্রয়ডারি তাই নয়, এর সঙ্গে গাঁথা হত মণিমুক্তো, রঙিন পাথরের ঝালর, আরশি, স্ফটিক, চুমকি। জরদৌসির কাজ আজও সর্বজনাদৃত এবং বহুল ব্যবহৃত। আজকের ফ্যাশন জগতে এর চোখ ধাঁধানো প্রয়োগ পাকাপাকিভাবে আসন পেতে চলেছে।

তবে এও ঠিক, শালের বিস্ময়কর অলংকরণ বংশানুক্রমিকভাবে চলে এসে এই শিল্পকে দিয়েছে অনন্যতা যা চিরদিন অননুকরণীয় থাকবে। কাশ্মীরি শালের মর্যাদাও থাকবে অস্পৃশ্য, অধরা।

প্রবল ঠাণ্ডায় এইসব শালের জুড়ি নেই, কারণ এগুলি সবই তৈরি হত পশুর নির্ভেজাল বাছাইকরা লোম থেকে। পশুরোমের একটি বিশেষ সীমাবদ্ধতা আছে, তা হল এতে



রঙ ধরানো বা ডাই করা যায় না। এগুলিতে কৃত্রিম উলের বিপুল বর্ণ বৈচিত্র্য নেই। তাই সব শালেরই হালকা ধোঁয়া রং, বালি রং, ঘি রঙের মতো সর্বগ্রাহ্য রঙগুলোই কালক্রমে আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উপমাস্বরূপ বলি, যদি কোন হুইস্কি প্রস্তুতকারক পানীয়টির রং লাল, নীল, সবুজে পরিবর্তিত করে, যা সহজেই সম্ভব, তাহলে হুইস্কি তার আভিজাত্য, মর্যাদা হারাবে না কি?

তবে শালের ঠিকুজি যদি আরও একটু বিস্তারিত করি, তবে আমাদের চতুর্দশ শতকে গুপ্তযুগে চোখ ফেরাতে হবে। বেলেপাথরে গড়া দণ্ডায়মান তথাগতর যে ভাস্কর্য আমরা দেখি, তাও বেষ্টিত আছে সূক্ষ্ম স্বচ্ছ একটি গাত্রাবাসে—যা শালেরই নামান্তর।

এবার টাইমমেশিনে চড়ে চলে যাই সিন্ধু সভ্যতার কালে। মহেঞ্জোদাড়ো লোগো শ্মশ্রুশোভিত পুরুষের একটি আবক্ষমূর্তি, গায়ে জড়ানো নক্সাদার শাল।

ইদানিং অভিযোগ শুনি, আধুনিক পুরুষরা নাকি সাজসজ্জায় বেশি মন দিচ্ছেন। একটু ভেবে দেখলে এর সঙ্গে তথ্যের বিরোধ আছে। উনিশশতকীয় বাবু গ্রীষ্মে উড়নি, শীতে শাল-ছড়ি-চেনঘড়ি, প্রত্যয়ী—এ ছবি কি কারুর অজানা?

বাংলা রেনেসাঁস-এর ব্যক্তিত্বগুলি স্মরণ করা যাক—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ—কার না ছবি শালাবৃত দেখেছি! আমাদের শৈশব-কৈশোরে সবচেয়ে সুন্দর সময় কেটেছে বাবা-মার সঙ্গে মিউজিয়ম, আর্ট এগজিবিশন, রঙ্গমঞ্চ, নিউমার্কেট ঘুরেফিরে।

এক রবিবার সকালে যাওয়া হল জোড়াসাঁকো। বারো তেরো বছরের কিশোরী অপার বিস্ময় আর মুগ্ধতায় দেখছে দ্বারকানাথের তৈলচিত্র। হাতে বহুমূল্য আংটির সারি, অভিনব আস্তিনের ছাঁট আর সব ছাপিয়ে কী অসাধারণ সুন্দর গায়ের শালখানা।

সমাজজীবনে যে ব্যক্তি বিলাসপ্রিয়, তাদের প্রতি লক্ষ রেখে বাৎস্যায়ন কামসূত্র রচনা করেছিলেন। সেইসব মানুষ যারা আচার আচরণে, বৈদগ্ধ্য ও কুশলতায় অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। তারা অভ্যাস করে কৃষ্টি, আড়ম্বর আর শৌখিনতা।

একবার মনে পড়ছে লেডি রানু বাড়িতে এলেন গায়ে একটি অসাধারণ কিছু জড়িয়ে। আমরা অবাক হয়ে দেখছি—উনি বললেন 'কী দেখছ? আমি একটু বেশি সাজগোজ করে ফেলেছি আজ—কিছু করার নেই, তোমাদের এখান থেকে যাব অন্য একটি নিমন্ত্রণে।' তারপর আমার কৌতূহলে জানান, একটি নীলাম্বরী ঢাকাই শাড়িকে গরম চাদরে জুড়ে একত্রিত করে তৈরি হয়েছে তাঁর গায়ের অঙ্গাবরণটি! কী যে সুন্দর তাকে দেখাচ্ছিল—আজও ভাবি!

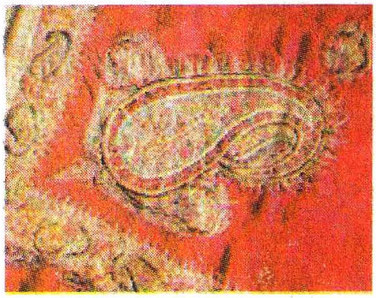
আজকের ফ্যাশনে শালের ব্যাপ্তি বিশাল। কাশ্মীরি, শান্তিনিকেতনি, বাটিক, গুজরাটি, আরশি আর পুঁতির কাজ, তসরের আলোয়ান—আরও কত? এই পাঁচহাতি গাত্রাবাসটি জড়ানোর ঢং-ই বা কত রকমের। ঠাকুরবাড়ি স্টাইল, শরৎচন্দ্র স্টাইল, শিশির ভাদুড়ি, বসন্ত চৌধুরি, ঋত্বিক ঘটক—শাল জড়ানোর স্টাইলের কত নামই না জড়িয়ে আছে।

ভাবুন তো স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের কথা। অপরিচ্ছন্ন স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে পা ফেলতে দ্বিধাগ্রস্থ রানি প্রথম এলিজাবেথকে নিজের গায়ের মহামূল্য ক্লোকটি বিছিয়ে দিচ্ছেন।

আজকের পুরুষ কাঁধের শালটি বিছিয়ে দেবার এমন বিরল 'শিভ্যলরি' দেখাবার সুযোগ কি হারাবেন!



ভাবুন তো স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের কথা... রানি এলিজাবেথ পা ফেলবেন বলে ভিজে মাটিতে বিছিয়ে দিচ্ছেন পরনের ক্লোকটি।



বসন্ত চৌধুরীর নিজস্ব সংগ্রহ

শালের যত্ন

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রত্নপুরুষ বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে কিছু অমূল্য সংগ্রহ। গণেশমূর্তি, মুদ্রা এবং অবশ্যই শাল।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাঙালির মনে বসন্ত চৌধুরী নির্দ্বিধায় শালের অন্তিম এবং অমোঘ প্রতীক।

কীভাবে শালের যত্ন নিতে হয়, লালন করতে হয় এই অপূর্ব উত্তরাধিকারকে— শিখিয়ে গিয়েছেন কনিষ্ঠপুত্র **সঞ্জিৎ চৌধুরীকে**



বাবার প্রতিটি শাল ছিল বাবার কাছে সন্তানের মতো। ঠিক নিজের সন্তানকে মানুষ যেভাবে যত্ন করে, প্রতিটি শালকে বাবা সেই সন্তান-স্নেহে যত্ন করে এসেছেন আজীবন। অধিকাংশ সময়ে বাবা ধুতি পরতেন। সরু কালো পাড়ের সেই ধুতিগুলি পুরনো হয়ে গেলে ফেলা হত না। ব্যবহার করা হত শালের রক্ষণাবেক্ষণে। শালগুলিকে ধুতি দিয়ে মুড়ে রাখতেন। প্রত্যেকটি শালের জন্য আলাদা, আলাদা ধুতি ব্যবহার করা হত। বাবা খেয়াল রাখতেন, যাতে শালে কোনওভাবে অন্য রং না লাগে। তাই, রঙিন কাপড়ের বদলে নরম, পুরনো, সাদা ধুতি ব্যবহার করা হত। এতে শালে কোনও রং লাগবার ভয় থাকত না।

তিন চার মাস অন্তর অন্তর বাবা সব শালকে বের করতেন। খুলে ফেলা হত পুরনো ভাঁজ। তারপর আবার ভাঁজ করা হত। খেয়াল রাখা হত, যাতে এবারের ভাঁজটা অন্যরকম হয়। অর্থাৎ, পুরনো ভাঁজের রেখার সঙ্গে যেন নতুন ভাঁজের রেখা না মেলে। এর ফলে, শালের ভাঁজে ভাঁজে কেটে যাওয়ার ভয় থাকে না।

ধুতি দিয়ে জড়ানো শালগুলিকে খুব সাবধানে আলমারিতে রাখা হত। তার উপর কোনও ভারি জিনিস বাবা রাখতে দিতেন না। এতে শালের সূক্ষ্ম কাজ ঠিক থাকত।

শাল রেখে দেওয়ার পর তার উপর বাবা নিমপাতা আর শুকনো লঙ্কা রেখে দিতেন। যাতে পোকামাকড় শালের কাছে ঘেঁষতে না পারে। তবে শালের যত্ন নেওয়ার জন্য বাবাকে কোনওদিন ন্যাপথেলিন ব্যবহার করতে দেখিনি।

শীত পড়লে, বাবা সকালে বা বিকেলে শাল রোদে দিতেন। অবশ্য ঠিক রোদে নয়, যে জায়গায় রোদ পড়েছে তার পাশে ছায়ায় শালগুলিকে মেলে দিতেন। এখানেই শেষ নয়। শালগুলির পাশে একটি লেদারের চেয়ারে বসে তিনি বই পড়তেন। ঠিক আচার পাহারা দেওয়ার মতো করে তিনি শালগুলির দিকে খেয়াল রাখতেন।

যে জায়গা থেকে রোদ সরে সরে যেত, তিনি সেখানে শালগুলিকে সরিয়ে-সরিয়ে রাখতেন। এইভাবে ক্রমাগত তিনি শাল শুকোনোর জায়গা বদল করতেন। শীতের মরসুমে অন্তত দিনসাতেক এইভাবে শালগুলিকে রোদের ছায়ায় মেলে দিতে দেখেছি।

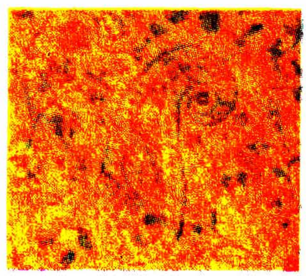
ছোটবেলায় দেখতাম, আমাদের বাড়িতে একজন বৃদ্ধ কাশ্মীরি শালওয়ালা আসতেন। দূরের জিনিস তিনি প্রায় দেখতেই পেতেন না। কিন্তু কাছের জিনিস দেখতে তাঁর কোনও অসুবিধে হত না। আমরা হাঁ করে দেখতাম, শালগুলিকে চোখের কাছে নিয়ে কী অদ্ভুত দক্ষতায় তিনি রিফু করে যাচ্ছেন। তিনি অবশ্য মারা গেছেন। তাই এখন আর শাল রিফু করা হয় না।

পশমিনা, জামেওয়ার, শাহ-তুস (অবশ্যই রেজিস্ট্রি করানো)—বাবার সংগ্রহে নানারকমের দামি শাল আছে। প্রত্যেকটি শাল ব্যবহার করার রীতিনীতি আলাদা। তবে, সব শালের জন্য যত্ন নেওয়ার পদ্ধতি কিন্তু একই। অন্তত, বাবাকে সেরকমই করতে দেখেছি। তবে খুব দামি শালের জন্য একটা স্পেশ্যাল ব্যবস্থা আছে। আমাদের বাড়িতে একটা চাইনিজ ক্যাম্ফর বক্স আছে। তার মধ্যে স্পেশ্যাল শালগুলিকে রাখা হয়। কর্পূর গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি এই বাক্সে রাখার জন্য শালগুলি পোকার আক্রমণের হাত থেকে বাঁচে। বাবার সেই রীতি এখনও আমরা অনুসরণ করি। দামি শালগুলিকে এখনও ওই চাইনিজ ক্যাম্ফর বক্স-এই রাখা হয়।

তবে হ্যাঁ! একটা কথা, শালকে যত্ন করার আর একটি উপায় হল সেগুলিকে নিয়মিত ব্যবহার করা।

ওই শাল নিয়ে কাঁধে ফেলে দিলাম, আর আমি জমিদার হয়ে গেলাম—এই ধারণা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। শাল নিলে সেটাকে ঠিকমতো ক্যারি করতে হবে। খেয়াল রাখবেন, শাল যেন সত্যি অর্থে আপনার আভিজাত্যের প্রতীক হয়। উল্টে আপনি যেন শাল নিয়ে জড়ভরত, আড়ষ্ট না হয়ে যান।

আপনার বাড়িতে বাবা-ঠাকুরদার শাল থাকলে তাকে শুধু বাক্সবন্দি করে রাখবেন না। এই শীতে বিয়েবাড়িতে ধুতি পাঞ্জাবির সঙ্গে স্বচ্ছন্দে শাল ব্যবহার করতে পারেন। তবে খেয়াল রাখবেন শালে যেন কোনও কিছু না লাগে। খেতে গিয়ে শালে মাটন কষার ঝোল পড়লে কী করবেন, আমার জানা নেই। কারণ, আমার বাবা বা আমার- কারও এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়নি। তাই একটা কথাই বলব, শাল কিন্তু অবশ্যই খুব সাবধানে ব্যবহার করবেন।


বসন্ত চৌধুরীর শাল

সেইসঙ্গে আর একটা জিনিসও মাথায় রাখবেন। সব শাল ব্যবহার করার পদ্ধতি কিন্তু একইরকম নয়।

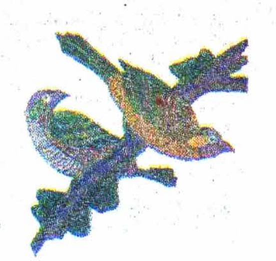
জামেওয়ার যদি একরকম করে নেন, পশমিনা অন্যভাবে নিতে হবে। অবশ্যই পার্থক্য থাকবে ভাঁজে।

বাবা এই ব্যাপারে দারুণ খুঁতখুঁতে ছিলেন। খুব যত্ন নিয়ে তিনি ভাঁজ করতেন। মাঝে মাঝে আমিও তাঁকে সাহায্য করতাম। কিন্তু, বাবা সবসময় শাল ধরতে দিতেন না। বাবার সামনে হাত মেলে দাঁড়াতে হত। তিনি পরীক্ষা করে দেখতেন হাতে কোনও ময়লা লেগে আছে কি না। যদি হাত পরিষ্কার থাকত, তবেই শাল ধরার অনুমতি মিলত। বাবার সঙ্গে হাত লাগিয়ে ভাঁজ করতে করতে শিখে গেছি শাল ব্যবহার করার আদব কায়দা। আর সত্যি কথা বলতে কি, এই কায়দা কাউকে বলে শেখানো যায় না। অনেকদিন ধরে ব্যবহার করতে করতে তবেই রপ্ত করা যায়।

বাড়িতে শাল থাকলে আপনিও শুরু করুন। একদিন দেখবেন, শাল আপনার বন্ধু হয়ে গিয়েছে। দিব্যি স্বচ্ছন্দে, স্মার্টলি শাল ক্যারি করতে পারছেন। কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। তখন হয়ত শীতকালের কোনও অনুষ্ঠানে ট্র্যাডিশনাল বাঙালি পোশাক ছাড়া অন্য কিছু পরতে ইচ্ছে করবে না।

শা
শালতামামি

সেই শালওয়ালারা



শীতের দুপুর। শালওয়ালার ঝোলার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা শালের বাৎসরিক রহস্য উন্মোচন। আর মা-কাকিমাদের অবাক চোখের শীতবিলাস। বাঙালি বাড়ির বড় পরিচিত এই খণ্ডমুহূর্তগুলো আজ অদৃশ্য। এই পৌষে কোথায় খুঁজব সেই চেনা, হারিয়ে যাওয়া শালওয়ালাকে?

ডাউনটাউন। শ্রীনগর।
দিনেরবেলাও এখানে পুলিশ ঢোকে না। সেনাবাহিনী? ঢোকে বটে কদাচিৎ। সামনে-পিছনে সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে। সে গাড়ি লোহার চাদরে মোড়া। বুলেট যাতে ঠিকরে চলে যেতে পারে। বুলেট থেকে না হয় রক্ষা পেলেন। কিন্তু গ্রেনেড? ডাউনটাউন-এ মহল্লায় মহল্লায় ইঁটের মতোই ওড়ে গ্রেনেড। সামান্য কারণে।

এ হেন ডাউনটাউন-এ সান্ধ্য আড্ডা? নেহাৎই অবিশ্বাস্য। তবু সঙ্গী কাশ্মীরি যুবক নাছোড়বান্দা। মেহমানকে ডাউনটাউনে কাবাব না খাইয়ে তিনি ছাড়বেন না। তাঁরই জেদে অগত্যা ডাউনটাউনে।

ছোট্ট একচিলতে কাবাবের দোকানে আলাপ বিলাল বাটের সঙ্গে। বয়স তাঁর নিশ্চিন্তে ষাট পেরিয়েছে। মুখের বলিরেখাই সেই কথা বলে দেয়। কাবাবের দোকানে অপরিচিত, অ-কাশ্মীরিকে দেখেই তাঁর কৌতুহল। এবং মেহমান কলকাতার শুনেই আচমকা বিলাল নস্ট্যালজিক।

কলকাতা! দেড় দশক আগেও তিনি যে শহরে যেতেন কাশ্মীরি শাল আর আখরোট নিয়ে। নুন-চা আর কাবাবে কখন যেন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হল। বিলাল আচমকাই হারিয়ে গেলেন শ্রীনগরের ঘিঞ্জি গলি থেকে শ্যামবাজার কিংবা ভবানীপুরের রাস্তায়। ভাবীদের শাল আর জ্যাকেট বিক্রি করার গল্প বলতে গিয়ে কখন যেন নিঃশ্বাস ভারিও হয়ে গেল।

'এখন তো আমরা এই শ্রীনগরেই কয়েদ। বুঝলেন না। কে আর যাবে দূরদেশে ব্যবসা করতে? এখানে রোজই কিছু না কিছু হচ্ছে। নয় কেউ মরছে। আর না হলে জেলে যাচ্ছে। তার মধ্যে ব্যবসা কী করে হবে বলুন! আর অনন্তনাগ পেরোলেই তো সকলে আমাদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়। ভাবে এই জঙ্গিটা আবার জুটল কোত্থেকে! কাশ্মীরি মানেই তো জঙ্গি।'

বিলালের কথায় আচমকাই সত্যি শৈশবে ফিরে যাই। স্কুল থেকে মা নিতে এসেছেন। গায়ে দেখি নতুন শাল। কাশ্মীরি শালওয়ালা নাকি সকালে এসে দিয়ে গেছে। মধ্যবিত্তের সংসারে আচমকা নতুন শাল কেনা বিলাসিতা না হোক, দস্তুরমতো ঘটনা তো বটে। 'জানিস না, নাসিম এমন করে বলল, না নিয়ে পারলাম না। মাসে মাসে মাত্র পঞ্চাশ টাকা করে নেবে। মার্চের মধ্যেই শোধ হয়ে যাবে।'

পুজোর পরেই এই নতুন কেনার আনন্দকে যাথার্থ্য দিতে মায়ের যুক্তির অন্ত ছিল না।

পুজোর পরে সবে শীতের পরশ লাগামাত্র বাড়িতে হাজির কাশ্মীরি শালওয়ালা। কাঁধের বিশাল বোঝা নামিয়ে দু'দণ্ড গল্প করেছে। চা-বিস্কুট খেয়েছে। এবং বিক্রির পর্বটাকেও ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। মাকে বুঝিয়েছে, আগামী ছ'মাস তো সে কলকাতাতেই থাকছে। অতএব ভাবী-র কাছ থেকে কিস্তিতে টাকা নিয়ে যাবে সে। ছ'মাসে তিনশো টাকা শোধ।

ডাউনটাউন-এ হুঁকোর টান দিতে দিতে বিলাল বাট যখন তাঁর যৌবনের কলকাতা আবিষ্কারকে পরতে পরতে খুলে ধরছেন, তখন আমিও যেন এক লহমায় দুই যুগ আগে ফেলে আসা শৈশবে। উত্তর কলকাতার বাড়িতে বসে লেপের তলায় হাত ঢুকিয়ে আখরোট খাওয়া। এবং অজানা এক পাহাড়ি রাজ্যের স্বপ্ন দেখা।

কুড়ি বছর আগের কলকাতায় যে-কাশ্মীরি শালওয়ালাদের দেখা পেতাম, তাঁরা গেলেন কোথায়? ডাউনটাউন-এর রাতের আড্ডায় নস্ট্যালজিক হওয়া গেল বটে, কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর





পাওয়া গেল না।

পরের দিন সকালে অগত্যা পোলো ক্লাবের পাশে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সৈয়দ সুজাত বুখারির ডেরায়। সুজাত বুখারি 'দ্য হিন্দু' পত্রিকার কাশ্মীরের ব্যুরো চিফ। সবাই তাঁকে কাশ্মীর বিশেষজ্ঞ বলেই মানে। এই কিছুদিন আগে তাঁকে জঙ্গিরা অপহরণ করলে পরে বিবিসি কিংবা সি এন এন-এ পর্যন্ত হেডলাইন হয়।

সামনে গরম কফি। আমার প্রশ্ন শুনে চুপ করে বসে আছে সুজাত। 'তুমি কখনও সোপোর গিয়েছ? সোপার? আপেলের রাজ্য সোপোর?' 'হ্যাঁ, কেন যাব না? শ্রীনগর থেকে উরি কিংবা বারামুলা যেতে গেলেই তো পথে পড়ে সোপোর। বড়জোর ষাট কিলোমিটার।' আমি জবাব দিই।

সুজাত হাসে। মৃদু এবং ম্লান। 'সোপোর কী জন্যে বিখ্যাত ছিল, জানো? আপেল আর শালের জন্য। দুনিয়ার সবচেয়ে ভাল আপেল ফলত সোপোরে। আর তৈরি হত শাল। আমরা বলতাম বেহেস্তের হুরিদের গায়ে মানায় সেই শাল। কত সিনেমার শুটিং হয়েছে জানো সোপোরে? শাম্মি কাপুরের সিনেমা। এখন সেই সোপোরে মিলিটারিও চট করে ঢোকে না। হুরিয়তের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি।' এক নিঃশ্বাসে বলে যায় সুজাত। ল্যাপটপে আঙুল বোলাতে বোলাতে গলার স্বর ঘন হয়ে আসে দুনিয়া দেখা সাংবাদিকের। 'যা যা দিয়ে কাশ্মীরকে চেনা যেত, আজ সেগুলোকে কষ্ট করে খুঁজতে হয়। সেই ডাল লেক নেই, সেই শিকারা নেই, সেই শাল নেই, সেই আপেলও নেই।'

সুজাত রাজনীতিটা জানে। জানে বুলেট আর এনকাউন্টারের ইতিহাস। সেইজন্যই রাজনীতি পায়ে পায়ে কখন বদলে গেছে, আমাদের চেনা কাশ্মীর বলে দিতে পারে।' সাতাশিতে কাশ্মীরের মসনদে ফারুক আবদুল্লা এলেন। নির্বাচন নামে এক প্রহসনের মধ্যে দিয়ে এবং শুরু হল তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ। আস্তে আস্তে জঙ্গি আন্দোলন।

এ কে সাতচল্লিশ, গ্রেনেড বদলে দিয়েছে কাশ্মীরকে। অনন্তনাগ থেকে বারামুলা পর্যন্ত একটা মুলুককে। লোকে যাকে একসময় ভূস্বর্গ বলে জানত। ১৯৮৭ থেকে ২০০২ কাশ্মীরিরা শুধু একটা জিনিস নিয়েই ভেবেছে। বুলেট। সে যে পক্ষেরই হোক। রক্ত তো আসলে ঝরেছে বিলাল বাটদেরই। না হলে তার কোনও ভাইয়ের।

নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকেই তাই এই শহরে হাসিখুশি, সুপুরুষ কাশ্মীরি শালওয়ালাদের দেখা মেলে না। 'ট্রেনে ওই ভারি বোঝা নিয়ে যাবে কোন কাশ্মীরি বলুন তো? কতবার চেকিং হবে বলুন! তারপরে যে শহরে যাবে, সেখানেও হাজারো মুসিবত, এখন ভারতের যে কোনও শহরে কাশ্মীরিরা গিয়ে থাকতে গেলেও পুলিশের নজরদারি। জেরা, তল্লাসি, মুসিবত হি মুসিবত।' শ্রীনগরের ধর্মতলা লালচকের সবচেয়ে বড় দোকানের মালিক নিশাদ ব্যাখ্যা দেন। অতএব শালওয়ালারা আর নেই।

শৈশবের স্মৃতিতে ভিড় করে থাকা কোলাজের মধ্যে লম্বা, ফর্সা, হাসিখুশি চেহারার যে কাশ্মীরিকে দেখতে পাই, সে এখন যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। নেই, একেবারে নেই। তখন ক্রেডিট কার্ড ছিল না। ছিল না ইএম আই। কিন্তু কাশ্মীরি শালওয়ালারা ছিল। মাসিক কিস্তির বিনিময়ে আমাদের অনেক ছোটবড় স্বপ্নপূরণ করে দিত। কাঁধের ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসত অনেক বিস্ময়। পারস্যের গন্ধমাখা অনেক বিস্ময়। শৈশবের মতোই সেই বিস্ময়ও আর নেই।

শ্রীনগরে গেলেই সুজাত একটা গ্রামে খুব নিয়ে যায়। বিমানবন্দরের পিছনে। বাটমালু পেরিয়ে। কয়েকটা ভাঙাচোরা বাড়ি। পুরনো মসজিদ। হতদরিদ্র চেহারা।

আর, গাড়ি এসে থামলেই কিছু সন্দেহাকুল মুখের উঁকিঝুকি। তাঁদের কে কাকে খবর দেয় বলা মুশকিল। সুজাত জানার চেষ্টা করে না। আর আমার পক্ষে তো অসম্ভব! গ্রামে যাওয়ার রাজনৈতিক কারণটা জানতাম।

গ্রামটা বিখ্যাত মহম্মদ সালাউদ্দিনের জন্য। সালাউদ্দিনের! কে সালাউদ্দিন? হিজবুল মুজাহিদিনের কম্যান্ডার ইন চিফ। করাচিতে বসে যাঁর দেওয়া বিবৃতি ওলটপালট করে দেয় এই উপমহাদেশকে। সেই সালাউদ্দিনের আদত ভিটে এই গ্রামে। সালাউদ্দিনের কথা জিজ্ঞেস করতেই নিজের নতুন সান্ট্রোতে হেলান দিয়ে সুজাত একটা বাড়ির দিকে হাত দেখাল। 'তুমি শালওয়ালাদের কথা জিজ্ঞেস করছিলে না? ওই বাড়িটা দেখ। এক সময় শ্রীনগরের কাছে সবচেয়ে ভাল শালের কারখানা ছিল ওটা। সবাই শাল কিনতে আসত। গ্রামটা বিখ্যাত ছিল শালের জন্যই।'

অবাক আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাই। পোড়ো বাড়ি। একতলা। গাছগাছালিতে ঢেকে গিয়েছে চারপাশ। কী জানি কেন, হঠাৎ মনে হল মৃণাল সেনের 'খণ্ডহর' আজ যদি কেউ রিমেক করেন, তাঁর হয়তো মনে ধরবে এই লোকেশনটা— এমনই বিধ্বস্ত তার চেহারা। একটা সংস্কৃতির ধ্বংসস্তূপ, একটা চিরন্তন শিল্পের প্রাগৈতিহাসিক ফসিল।



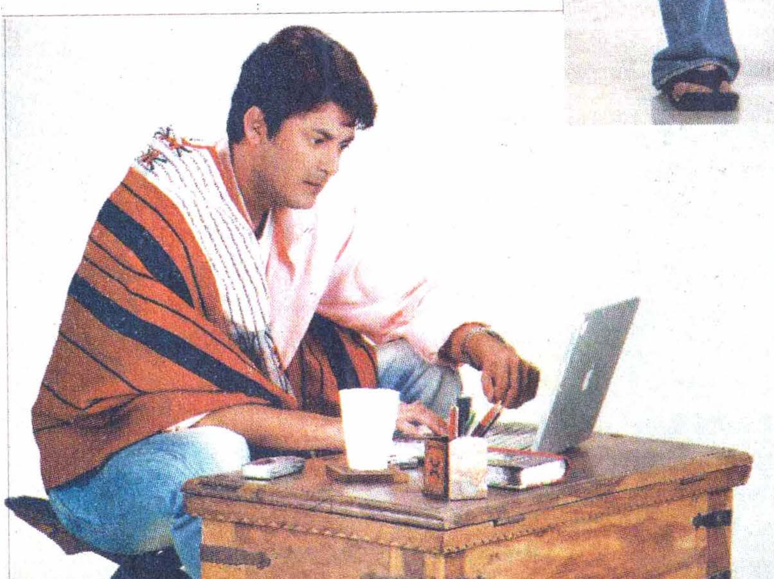
রোববার-এর শালে কলকাতার যীশু





পর্দায় ফেলুদাকে আমরা প্রথম দেখি মেরুন পাঞ্জাবি, জিনস আর শালে। বাঙালির সেই আইকনকে নকশা শালে নিজস্ব করে নিলেন যীশু। স্ত্রী নীলাঞ্জনা (নাকি কোনও বান্ধবীর?) এস এম এস পড়ে নেওয়ার ফাঁকে...

শাল মানেই যে আড়াআড়িভাবে পরতে হবে, তার কোনও মানে আছে?
ক্যাজুয়াল পোশাকের সঙ্গে কেজো পশমের শাল দু'কাঁধ বেয়ে ফেলে রাখা যীশুর পছন্দ...আর পছন্দ নতুন বেস্টসেলার



শীতকালের রোববার। আজ শুটিং নেই। সারা সপ্তাহের ই-মেল পড়ে রয়েছে ইনবক্সে—উত্তর দেওয়া হয়নি। গরম কফি আর নাগা শাল। এই না হ'লে শীতসকাল!

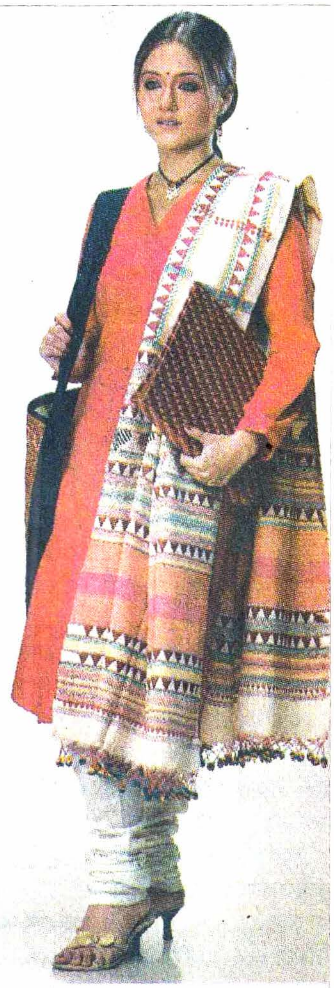
শীতে স্বস্তিকা, শাল মস্তি কা...



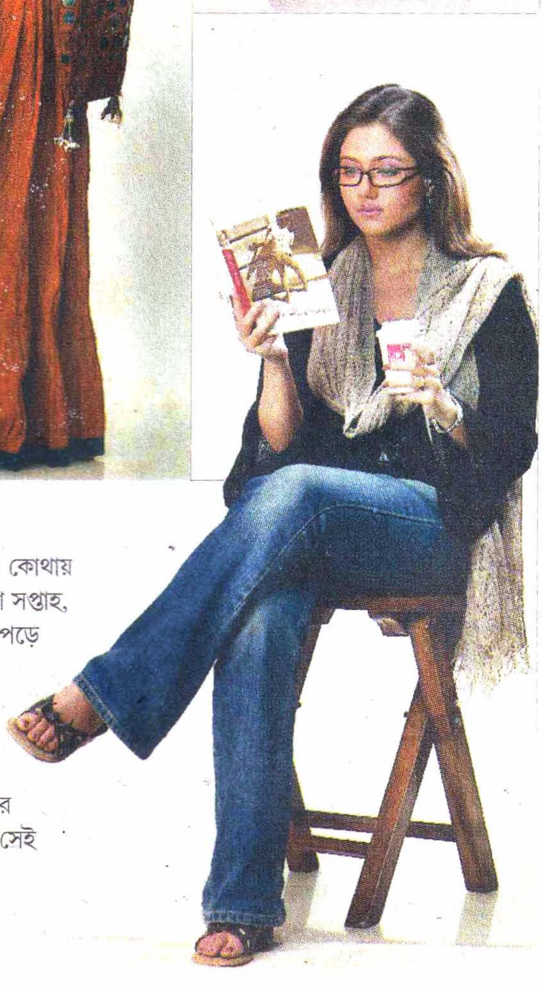
কলমকারি কুর্তি, কটন লং স্কার্ট, তার সঙ্গে প্রিন্টেড উলেন শাল। সকালবেলার কোনও অনুষ্ঠানে স্বস্তিকার পছন্দ। ছবির ব্লুমিংডেল শালটা আমেরিকা থেকে এনে দিয়েছিলেন বাবা



মা'র সঙ্গে বেরোনো, বিশেষ করে আত্মীয়বাড়ি—মানেই শাড়ি। কমলা সবুজ সাউথ কটন, ম্যাচিং পুণে ব্লাউজের সঙ্গে দিব্যি মানায় কালো মেরুন বাঁধনি করা গরম চাদর



চুড়িদার কুর্তার সঙ্গে কেবল দোপাট্টা কেন? শীতকালে দিব্যি নেওয়া চলে সুতির শাল। কাথিয়াওয়াড়ি এই শালটা স্বস্তিকা কিনেছিলেন স্বভূমির দস্তকরি মেলা থেকে



রিল্যাক্স করা, বই পড়ার সময় কোথায় স্বস্তিকার? শুটিং, ডাবিং...সারা সপ্তাহ, উফ! তার মধ্যেই সময় করে পড়ে ফেলা নতুন বই। বারান্দার রোদ্দুরের মতো আলতো করে গলায় জড়ানো সিন্থেটিক নেটের স্কার্ফ। অবশ্য এই অবসরটুকু স্বস্তিকার মাস্ক লাগানোর সময়ও বটে। সেই ছবিটা আমরা আর দিলাম না

ছবি সনৎ ঘোষ
রূপ অনিরুদ্ধ চাকলাদার

কলিকাতায় নবকুমার

সমরেশ মজুমদার

(২)

স্নান খাওয়া শেষ করে নবকুমার ঘোষণা করল। শোনামাত্র মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সরে গেল সামনে থেকে। চিৎকার দূরের কথা, একচিলতে কান্নাও তাঁর গলা থেকে বের হল না। কিন্তু বাবা এসে দাঁড়াল সামনে, "যাচ্ছ যাও, কিন্তু কাল যদি তোমার মা মারা যায় তা হলে খবর পাঠাব কোন ঠিকানায়? সেটা দিয়ে যাবে।"

হকচকিয়ে গেল নবকুমার। মাস্টারদার সঙ্গে সে কলিকাতায় যাবে রোজগার করতে। এর বাইরে সে কিছুই জানে না। সেখানে যাওয়ার পরে যেখানে থাকবে সেটাই তার ঠিকানা হবে। মাস্টারদাও কিছু বলেনি। একবার বলেছিল, "মনে রেখো এখন তুমি একটা পাতা। গাছ থেকে খসে নদীর স্রোতে পড়েছ। নদী তোমাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলবে তা তুমি জানবে কী করে? নদী নিজেই জানে না। এই নদীর নাম কি জানো?" হেসেছিল মাস্টারদা, "জীবন।"

এসব কথা শুনতে খুব ভাল লেগেছিল। এখন বাবার সামনে দাঁড়িয়ে সে বুঝতে পারল মনে যা দাগ কাটে মুখে তা বলা যায় না। নবকুমার নিচু গলায় বলেছিল, "কলিকাতায় যাওয়ার পর ঠিকানা জানতে পারব।"

"ও।" বাবা একটু ভাবল,' দিন সাতেকের মধ্যে যদি ঠিকানা না জানাতে পার তা হলে দয়া করে ফিরে এসো দশ দিনের মাথায়।

বেরুবার সময় মা-বাবাকে প্রণাম করতেই বাবার প্রশ্ন, "সঙ্গে টাকা আছে?"

"হ্যাঁ।"

"কত?"

"দুশো।"

"সর্বনাশ। এত টাকা তুমি কোথায় পেলে?"

'অনেকদিন ধরে জমিয়েছি।'

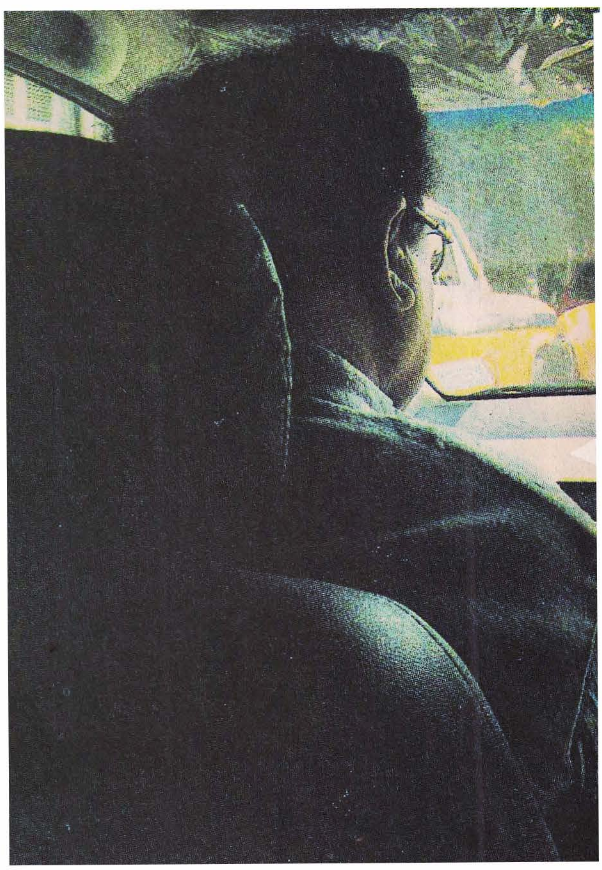
"চমৎকার।"

"মা!"

মা অন্যদিকে মুখ ঘোরানো। "কলিকাতা থেকে কোনও শাকচুন্নীকে বউ করে নিয়ে এলে আমি গলায় দড়ি দেব।"

হাতে একটা টিনের স্যুটকেস। স্যুটকেসের ওপর একটা লাল গোলাপ আঁকা। স্টেশনের পথে আসার সময় অন্তত তেরোজন হাজার প্রশ্ন করল। এই গ্রামের কেউ রোজগার করতে কলিকাতায় যায়নি। নবকুমার যখন যাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই অনেক বড়লোক হয়ে ফিরবে। কেউ কেউ আবদার করল, নবকুমার ওখানে গিয়ে থিতু হলে ভরসা পেয়ে সে-ও যাবে।

রতনের দোকানে মাস্টারদা বসে পা দোলাচ্ছে। তাকে দেখে বলল, "ভাল করেছিস। শার্ট পাজামা পরলে চালাক চালাক বলে মনে হয় না। তাই যে দেখবে সে-ই তোকে ভাল



মানুষ বলে মনে করবে। চল।"

সেকেন্ড ক্লাস ট্রেনে কলিকাতায় পৌঁছতে অনেক টাকার টিকিট কাটতে হল। ট্রেন এল। মাস্টারদা তাকে নিয়ে যে কামরায় উঠল সেটা যাত্রীঠাসা। কোনওমতে বেঞ্চির এক চিলতে জায়গা আবিষ্কার করে মাস্টারদা বলল, "দয়া করে বসে পড়। আমার জন্য চিন্তা করো না। আমি ঠিক জায়গা তৈরি করে নেব।"

কামরা দুলে উঠল, ট্রেন চলল। আধখানা জানলা দিয়ে শেষ বিকেলের আলোয় নবকুমার দেখতে পেল গ্রামে যাওয়ার রাস্তা, ভ্যান রিকশা, মুখার্জিদের পোড়ো শিবমন্দির পিছনে পিছনে যাচ্ছে। তারপরেই মাঠঘাট, জঙ্গলের ছবি। বুকের ভিতরটা কিরকম শিরশির করে উঠল তার। চোখ বন্ধ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। স্কুলে পড়ার সময় একজন প্রবীণ শিক্ষক কিছুদিনের জন্যে তাদের স্কুলে এসেছিলেন। তিনি বলতেন "যখনই মন অনিশ্চিত হবে, সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না, ভয় পাবে তখনই চোখ বন্ধ করে বিবেকানন্দের কথা ভাববে। দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করা সেই তেজোদীপ্ত মানুষটিকে বন্ধ চোখের পাতায় দেখতে চাইবে। দেখবে মনে বল এসে যাবে।" সমস্যায় পড়লেই সে চোখ বন্ধ করে বিবেকানন্দকে স্মরণ করত। আজ এই সন্ধে নামা সময়ে ছুটন্ত ট্রেনের কামরায় বসে চোখ বন্ধ করে বিবেকানন্দকে দেখার পর ধীরে ধীরে মন ধাতস্থ হল।

ইতিমধ্যে তিনটি স্টেশন ছুঁয়ে ট্রেন চলেছে অন্ধকার দিয়ে। মাস্টারদা ইতিমধ্যে জায়গা পেয়ে গেছে। আশেপাশের লোকদের এগিয়ে দেওয়া বিড়ি টানতে টানতে তাদের গল্প শোনাচ্ছে। ও পাশে কিছু লোক ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল হল মাস্টারদার, "আরে, তুমি এখনও উচ্চিংড়ের মতো বসে আছো? কত লোক নামল, জায়গা করে নিলে না। শোন নবকুমার, বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের উপকার করতে তোমাকে কাঠ কাটতে পাঠিয়ে নৌকো ছেড়ে দিয়েছিল। তা থেকে তোমার শিক্ষা নেওয়া উচিত। ওই, ওইখানে গিয়ে আরাম করে বসো।"

দূর থেকে চেঁচিয়ে কথাগুলি বলে আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিল মাস্টারদা। জায়গাটা দেখে সিঁটিয়ে গেল নবকুমার। কামরার কোনের দিকে যে পরিবারটি চলেছে তাদের পাঁচজনের মধ্যে চারজনই মহিলা। একজন বৃদ্ধ ওদের সঙ্গে। স্টেশনে স্টেশনে কিছু লোক নেমে যাওয়ায় ওরা হাত-পা ছড়িয়ে বসেছে। ওখানে গেলে ওরা নিশ্চয়ই খুশি হবে না।

"আরে! ভাবার কি আছে?" মাস্টারদা চেঁচাত, "এই পৃথিবীর নিয়ম হল কেউ তোমাকে জায়গা করে দেবে না, তোমাকে নিজেই জায়গা আদায় করতে হবে। যাও।" মাস্টারদা এরই মধ্যে যাদের সঙ্গী করে ফেলেছে তারা দাঁত বের করে হাসছে দেখে নবকুমার উঠে দাঁড়াল। স্যুটকেশ নিয়ে ভিড় সামলে কোণের দিকে গিয়ে দাঁড়াল সে। সবচেয়ে বয়স্কার বয়স অন্তত সত্তর। তারপর পঞ্চাশ, পঁয়ত্রিশ, পনেরো। ওরা তাকে দেখেও দেখল না। প্রায় ঘাড়ের কাছে স্যুটকেশ হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন আর দলের ছুটকি চাপা গলায় বলল, "একটু কাৎ হয়ে শুয়ে পড়!"

বয়স্ক ব্যাপারটা না বুঝে বলল, "এই ভর সন্ধ্যেবেলায় শুবি কিরে? হ্যাঁ! একটু পরে খাবার খেয়ে তারপর ঘুমাস।!

পঞ্চাশ বলল, "মা বোতলে জল কম আছে।"

"থাকবেই তো। ইস্টিশনে এসেই ঢোক ঢোক করে এক পেট জল খেয়ে নিলেন ইনি। পই পই করে বললাম, যাও আবার জল ভরে নিয়ে এসো, কানেই তুলল না।" বয়স্কা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

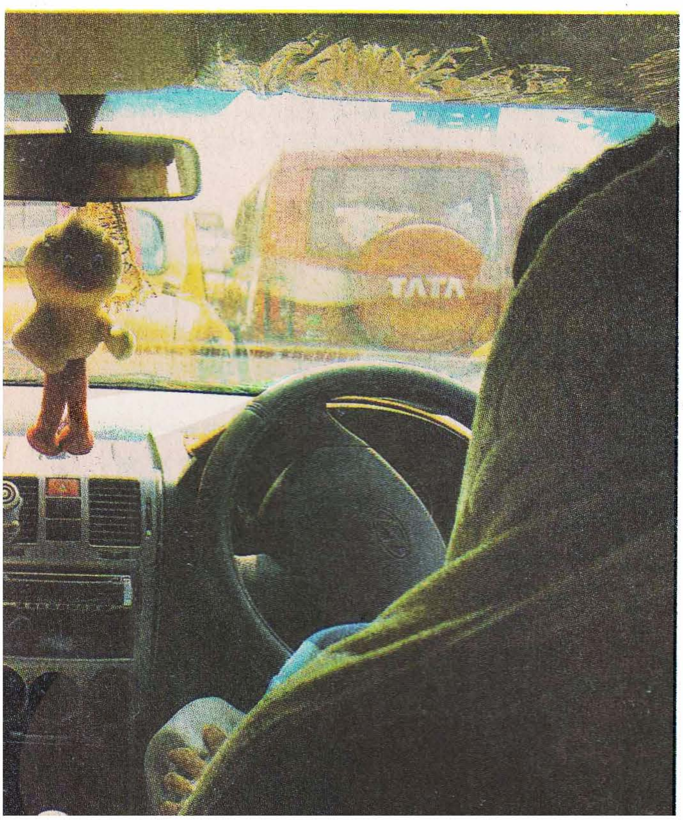
একপাশে বসে বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে থেকেই বললেন, "কি করব! ট্রেন এসে গিয়েছিল যে। জল আনতে গেলে ট্রেনে উঠতে পারতাম না।"

"তা হলে খাবার খেয়ে জল চেয়ো না।"

ছুটকি বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। পরের স্টেশনে নেমে জল নিয়ে আসব।

বয়স্কা চোখ কপালে তুলল, "সর্বনাশ! এই রাত্তিরে অজানা জায়গায় তুই যাবি জল আনতে? ঘাটে কি আর মড়া নেই যে তুই যাবি ভিড় বাড়াতে?"

ধমক খেয়ে ছুটকি চুপ। বৃদ্ধ বললেন,



"কাউকে যেতে হবে না। আমিই যাব।"

পঞ্চাশ বলল, "না বাবা। যদি ট্রেন ছেড়ে দেয় আর তুমি উঠতে না পার।"

"তা হলে তোর মা দু'হাত তুলে নাচবে, তোরা নৃত্য দেখবি।" বৃদ্ধ বললেন।

পঁয়ত্রিশ বয়স্কাকে ইশারা করল চুপ করতে। তারপর বলল, "তার চেয়ে কাউকে একটু ভাল করে বললেই হয়, এনে দেবে। মানুষের মনে তো এখনও দয়া মায়া আছে।"

বয়স্কা, "তাই নাকি? দেখি!" মুখ ফিরিয়ে নবকুমারের দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করল। "ও ভালমানুষের ছেলে, বলি যাওয়া হচ্ছে কোথায়?"

এতক্ষণ নবকুমারের মনে হচ্ছিল রেডিওর নাটক শুনছে। বলল, "কলিকাতায়।"

সঙ্গে সঙ্গে পঁয়ত্রিশ আর পনেরো খিলখিল করে হেসে উঠল।

বয়স্কা ধমক দিল, "এ্যাই, থাম।"

বৃদ্ধও ধমক দিলেন, "হাসছিস কেন? হ্যাঁ? ছেলেবেলায় শুনেছি, আসল নাম ছিল কলিকাতা। সাহেবরা বলত ক্যালকাটা। তা থেকে কোলকাতা। তা বাবা, তুমি কি কোলকাতায় থাক?"

"না।" নবকুমার বুঝতে পারছিল না এরা ওইভাবে হাসল কেন? সে বইতে পড়েছে, কলিকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম ছিল। পরে তারা একত্রিত হলে নাম রাখা হয় কলিকাতা। তা হলে ভুল কী বলল।

"এই প্রথম যাচ্ছ নাকি?" বৃদ্ধের কৌতূহল কমছিল না।

"হ্যাঁ।"

"তা বলছিলাম কী, আমাদের একটু জল দরকার। আমি তো বুড়ো মানুষ আর সঙ্গে, দেখতেই পাচ্ছ, সব মেয়েছেলে।"

সঙ্গে সঙ্গে পনেরো ফোঁস করে উঠল, "আবার মেয়েছেলে?"

এইসময় ট্রেনের গতি কমে এল। অন্ধকার পেরিয়ে একটু আলোকিত স্টেশনে গাড়ি থামতেই পঁয়ত্রিশ দু-দুটো জলের বোতল নবকুমারের দিকে এগিয়ে ধরল। হাতের স্যুটকেস কোথায় রাখবে বুঝতে পারছিল না সে, পঁয়ত্রিশ বলল, "এই, স্যুটকেশটা ধর।"

পনেরো ছোঁয়া বাঁচিয়ে স্যুটকেশ ধরল।

বোতল দুটো নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে মাস্টারদার দিকে তাকাল নবকুমার। মাস্টারদার তখন তার পাশের লোকটিকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে কিছু বোঝাচ্ছে।

কামরা থেকে নামল নবকুমার। আধা আলোছায়ায় মোড়া প্ল্যাটফর্মে জলের কল নজরে এল না। একজনকে জিজ্ঞাসা করতে সে দূরের দিকে হাত তুলল। নবকুমার দ্রুত পা চালালো। অনেকটা যাওয়ার পরে টিউবওয়েল চোখে পড়ল। তাকে ঘিরে একটা জটলা। শেষ পর্যন্ত সুযোগ পেতেই সে হাতল নাড়তে নাড়তে বোতলে জল ভরতে লাগল। এবং তখনই হুইসল দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করল।

একটা বোতলের গলা পর্যন্ত জল ভরে এসেছে, দ্বিতীয়টি ফাঁকা। সেই অবস্থায় দৌড়তে লাগল নবকুমার। ইতিমধ্যে ট্রেনের গতি বাড়ছে। যে কামরায় ওরা ছিল সেখানে পৌঁছনো অসম্ভব বুঝতে পেরে কোনওমতে সামনের কামরায় উঠে পড়ল সে। উঠে দেখল কামরাটা প্রায় ফাঁকা। দুজন লোক গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"নেক্সট স্টেশনে নেমে যাবে।" একজন গম্ভীর গলায় বলল।

দ্রুত মাথা নাড়ল নবকুমার। তখনও তার বুকের ভিতরটা ধক ধক করছিল। আর একটু হলেই ট্রেনটাকে ধরতে পারত না। মাস্টারদা নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবে। অন্যের উপকার করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনার জন্যে ধমকাবে। এবং এটা মনে হতেই হেসে ফেলল সে। নবকুমার সহযাত্রীদের উপকার করতে কাঠ কাটতে জঙ্গলে গিয়ে পথ হারিয়েছিল। তাকে ফেলেই সহযাত্রীরা নৌকো নিয়ে চলে গিয়েছিল। তারও অবস্থা আর একটু হলে ওইরকম হচ্ছিল। হঠাৎ কানে এল, "পাগল নাকি? একা একা হাসছে!" শোনামাত্র নবকুমার গম্ভীর হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল না এত বড় কামরায় মাত্র দুজন লোক বসে আছে কেন? যেখানে অন্য কামরায় যাত্রীরা ঠাসাঠাসি সেখানে একটা পুরো কামরা খালি যাচ্ছে?

পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই সে প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দুজনের একজন দরজায় চলে এসে গম্ভীর গলায় বলল, "এটা মিলিটারির অফিসারদের জন্য। এর পরের বার না দেখে উঠলে বিপদে পড়বে। গেট আউট।"

দ্রুত পা চালাল নবকুমার। হঠাৎ কানে এল, "ওই যে, ওই যে।"

মুখ তুলে সে দেখতে পেল পনেরো বছরকে। কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে তাকে দেখাচ্ছে পঁয়ত্রিশকে। নবকুমার দরজার কাছে পৌঁছতে পঁয়ত্রিশ বলল, "উঃ কী ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমরা। আপনি যদি জলের জন্যে ট্রেনে না উঠতে পারতেন তাহলে আমরাই দায়ী হতাম।"

পনেরো বলল, "আগে ওকে ওপরে উঠে আসতে বল তারপর এসব শোনাও।" নবকুমার লক্ষ করল দূর থেকে তাকে দেখে পনেরোর মুখে যে উচ্ছ্বাস ঠিকরে উঠেছিল এখন তা উধাও। সে ওপরে উঠে এসে এক বোতল জল পঁয়ত্রিশের দিকে এগিয়ে ধরল। "কোনওমতে একটাই ভরতে পেরেছিলাম।"

"তাতেই হবে। অনেক ধন্যবাদ।" ওরা ফিরে গেল নিজের নিজের জায়গায়।

মুখ ফেরাতেই চোখাচোখি হল মাস্টারদার সঙ্গে। বিড়ি টানতে টানতে উঠে এল মাস্টারদা, সামনে দাঁড়িয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

"তুমি কার সঙ্গে কলিকাতায় যাচ্ছ?"

"আপনার সঙ্গে।"

"অতএব আমার কিছু দায়িত্ব থেকেই যাচ্ছে তোমার

সম্পর্কে।"

মুখ তুলল না নবকুমার।

"পরোপকার করার ধান্দায় যদি অজানা স্টেশনে জল আনতে ছুটে যাও এবং ফিরে না আস তা হলে বঙ্কিমবাবু যাই বলে থাকুন আমি তোমাকে গর্দভ ছাড়া আর কিছু বলব না। দ্বিতীয়বার এই কর্মটি করো না।" বিড়ির বাকিটা বাইরে ছুড়ে ফেলে খিক খিক শব্দে হাসল মাস্টারদা।

বকুনির পরেই হাসিতে অবাক হল নবকুমার, "হাসছেন কেন?"

"হাসব না? তুমি তো দেখছি জব্বর মেয়ে-কপালে ছোকরা। ট্রেনে উঠতে না উঠতেই মেয়ে জুটিয়ে ফেললে। তাও একটা নয়, এক জোড়া?"

"কি যা তা বলছেন?"

"যা-তা? বোনঝি বলে আমার দোষ, মাসী বলে আমার!"

"আপনি কী করে এদের সম্পর্ক জানবেন?"

"এটা জানতে না পারলে চিৎপুরে করে খাচ্ছি কী করে? তোমাকে জল আনতে পাঠালো কেন বলে ধমকাতেই সব বেরিয়ে পড়ল। তবে একটা কথা শোন, মেয়ে-কপালে হও অথবা পরোপকারে ঝাঁপাও, সবসময় মনে রাখবে তুমি একটা ঘোড়া, তোমাকে রাশ টেনে নিজেকে থামাতে হবে।" মাস্টারদা চলে গেল তার জায়গায়।

নবকুমার ভেবেছিল সে ফিরে এসে সবার কাছে সহানুভূতির কথা শুনতে পাবে, মানুষের উপকার করতে যাওয়াটা এখন অপরাধ বলে মনে হল।

স্যুটকেশটা নেওয়ার জন্য সে মহিলাদের কাছে যেতেই বয়স্কা বলল, "খুব চিন্তায় পড়েছিলাম বাবা। কোনও সমস্যা হয়নি তো?"

"না।"

"বেশ সাহসী মনে হচ্ছে।" পঁয়ত্রিশ কথাটা বলে ঠোঁট মোচড়ালো।

"আমার স্যুটকেশটা!"

"ওমা, তুমি তো কোলকাতায় যাবে, এখনই স্যুটকেস নিয়ে কী করবে! এস। ওখানে বস। বাড়ি থেকে কি খাবার এনেছ? বয়স্কা জিজ্ঞাসা করল।

"না।"

"তা হলে তো তোমাকে বসতেই হবে। বসো। ও ছুটকি, একটু জায়গা করে দে না।" যাকে বলা হল তার মুখ গম্ভীর, "আবার?"

"ওহো! আর ভুল হবে না।" বয়স্কা হাসল।

পনেরো বছর খানিকটা শরীর সরালে বসার জায়গা পেল নবকুমার। সন্তর্পণে সে বসল সেখানে। বসেই মাস্টারদার দিকে তাকাল। মাস্টারদার মুখ দেখা যাচ্ছে না ওখান থেকে।

এইবার বয়স্কা ব্যাগ থেকে অনেকগুলো কৌটো বের করে আবার ভাগ করতে শুরু করল। পঞ্চাশ তাকে সাহায্য করছিল। গোটা চারেক রুটি, তরকারি আর একটা মিষ্টি শালপাতায় সাজিয়ে বয়স্কা এগিয়ে ধরতে পঁয়ত্রিশ সেটা নিয়ে নবকুমারকে দিল। নবকুমার অপেক্ষা করল। আজ

নবকুমার সহযাত্রীদের উপকার করতে কাঠ কাটতে জঙ্গলে গিয়ে পথ হারিয়েছিল। তাকে ফেলেই সহযাত্রীরা নৌকো নিয়ে চলে গিয়েছিল। তারও অবস্থা আর একটু হলে ওইরকম হচ্ছিল।

দুপুরে বাড়ির খাবার সে তৃপ্তি করে খেতে পারেনি। এখন খাবার দেখার পর ক্ষিদে বেশ চাগিয়ে উঠল। কিন্তু আগেই খেতে শুরু করলে অভদ্রতা হবে বলে সে চুপচাপ বসে রইল।

খাওয়া শুরু করার পর বয়স্কা জিজ্ঞাসা করল, "কেমন লাগছে রান্না?"

বৃদ্ধ এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার বললেন, "এটা আবার রান্না নাকি? একটা যাহোক তরকারি' বুঝলে হে, নামটা কী যেন-?"

"আজ্ঞে, নবকুমার।"

পাশে বসা পনেরো বছর ফিক করে হেসে উঠল।

নবকুমার বুঝল এই মেয়েটার অকারণে হাসির অভ্যেস আছে।

"হ্যাঁ, বুঝলে হে নবকুমার, আমার মায়ের হাতের রান্না খেলে ভুলতে পারবে না।" বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে বললেন, "অমৃত হার মানে!"

"কান ঝালাপালা হয়ে গেল। যেন অমৃত কত খেয়েছে!" বয়স্কা বলল। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ চুপ। খেতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল নবকুমারের। আলু পটলের তরকারিতে যেন চিনি ঢেলে দিয়েছে, রান্নার সময়। তাদের বাড়িতে রান্না হয় একটু ঝাল ঝাল। শুকনো লঙ্কা নয়, কাঁচা লঙ্কার ঝাল থাকলেও স্বাদ হয় ভাল' তরকারিতে মিষ্টি খাওয়ার কথা ওরা ভাবতেই পারে না। তবু খেতে হল।

"যে এনেছে সে এক ঢোঁক জল প্রথমে খাক।" পঁয়ত্রিশ বোতল এগিয়ে ধরল। ঠিক এক ঢোঁক জল গলায় ঢেলে শালপাতা বাইরে ফেলে দিল নবকুমার জানলা গলিয়ে। হঠাৎ তার খারাপ লাগা শুরু হল। একসঙ্গে এসে সে একা একা খেয়ে নিল আর মাস্টারদা না খেয়ে রয়েছে। নবকুমার উঠল। মাস্টারদার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "খাওয়া-দাওয়া করবেন না?"

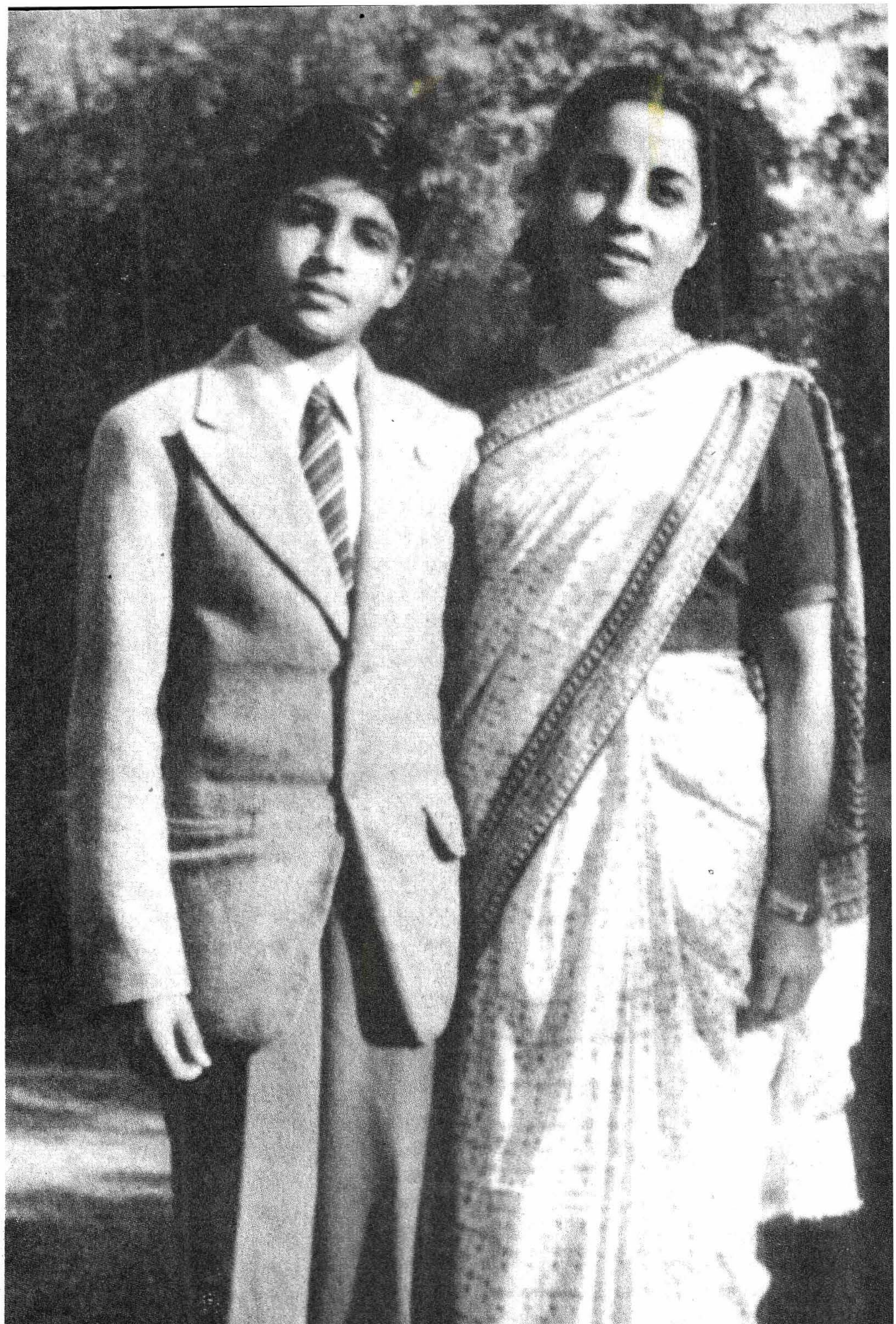
"সামনের স্টেশনে পাঁচ মিনিট থামবে। তখন পুরি আর তরকারি খাব।"

"আমাকে ওরা জোর করল! অবশ্য খেতে একটুও ভাল লাগেনি। কী মিষ্টি!"

"পেটে তো গেছে। আরে এতে সঙ্কোচের কারণ নেই। একজনের খাওয়া খরচ তো বেঁচে গেল। পরে ওটা কাজে লাগবে। মেয়েছেলেগুলোকে শুধু ঘাড়ে চড়তে দিও না।"

(পরের এপিসোড আগামী সপ্তাহে)





শেরউডে যাবার আগে মার সঙ্গে

চলতি রহে জিন্দেগি

কবিপুত্রের নাম পাল্টে অমিতাভ করেছিলেন অন্য এক কবি। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত চত্বরের সেই বাড়িটায়। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা শুরু। বাসা বদল। শহর বদল । শৈশব থেকে কৈশোরে এক বিষন্ন ভ্রমণ। সেই সঙ্গে বুঝতে শেখা - নায়ক কাকে বলে? অমিতাভ বচ্চনের আত্মকাহিনী

দ্বিতীয় দৃশ্য

আমার প্রথম দেখা সিনেমা Flying Deuces । দেখেছিলাম এলাহাবাদ-এর সিভিল লাইনস-এর প্যালেস সিনেমায়। বাড়ি থেকে সিনেমা খুব একটা দেখতে দেওয়া হত না। ওই কেবল বাচ্চাদের সিনেমা এলে, তখন না হয় ... Androcles and the Lion, Robin Hood, Snow White and the Seven Dwarfs এই রকম সব নানা Walt Disney কার্টুন। আর ঘন ঘন সিনেমা যে যাব, তার পয়সা কোথায়? সিনেমার টিকিটের চার আনা- পাঁচ আনা দাম। তাই আমাদের সংসারে তখন দুর্মূল্য।

সত্যি কথা বলতে কী, পর্দায় দেখা আমার প্রথম নায়ক স্ট্যান লরেল আর অলিভার হার্ডি এবং তখন আর সব বাচ্চাদের মতো আমিও জানি নায়ক বা হিরো মানে যা কিছু ভাল, শুভ—তার প্রতিমূর্তি। আমার দেখা প্রথম হিন্দি ছবি 'জাগৃতি'।

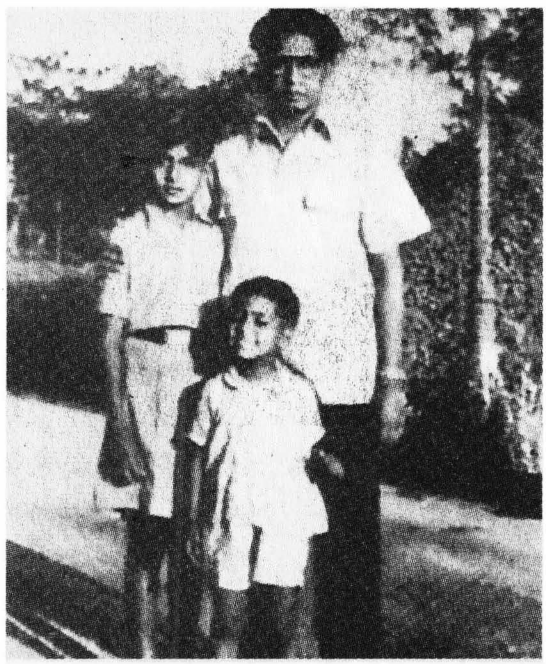
অ্যাডেলফির শান্ত পরিবেশ ছেড়ে আমরা দিন কয়েকের মধ্যেই অন্য বাড়িতে গেলাম। এলাহাবাদেই, ব্যাঙ্ক রোড এর বাড়িতে। দেশভাগের কষ্ট আমার সরাসরি মনে নেই, কিন্তু প্রথম বসতবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া যে কী, আমি আজও ভুলতে পারিনি। অনেক পরে যখন 'পথের পাঁচালি' দেখেছি। শেষ দৃশ্যে গলার কাছটা কেমন যেন ব্যথা ব্যথা করেছে। আমার হয় তো তখন ওই অপুর মতোই বয়স হবে কিংবা আরেকটু ছোট।

ব্যাঙ্ক রোডের পাশেই থর্নহিল রোড বলে একটা রাস্তা ছিল। সেখানে ছিল একটা দুর্গের মতো বাড়ি। সেই বাড়ির অধিশ্বরী ছিলেন এক রহস্যজনক মহিলা। শুনেছিলাম তাঁর নাম রানি বিটিয়া।

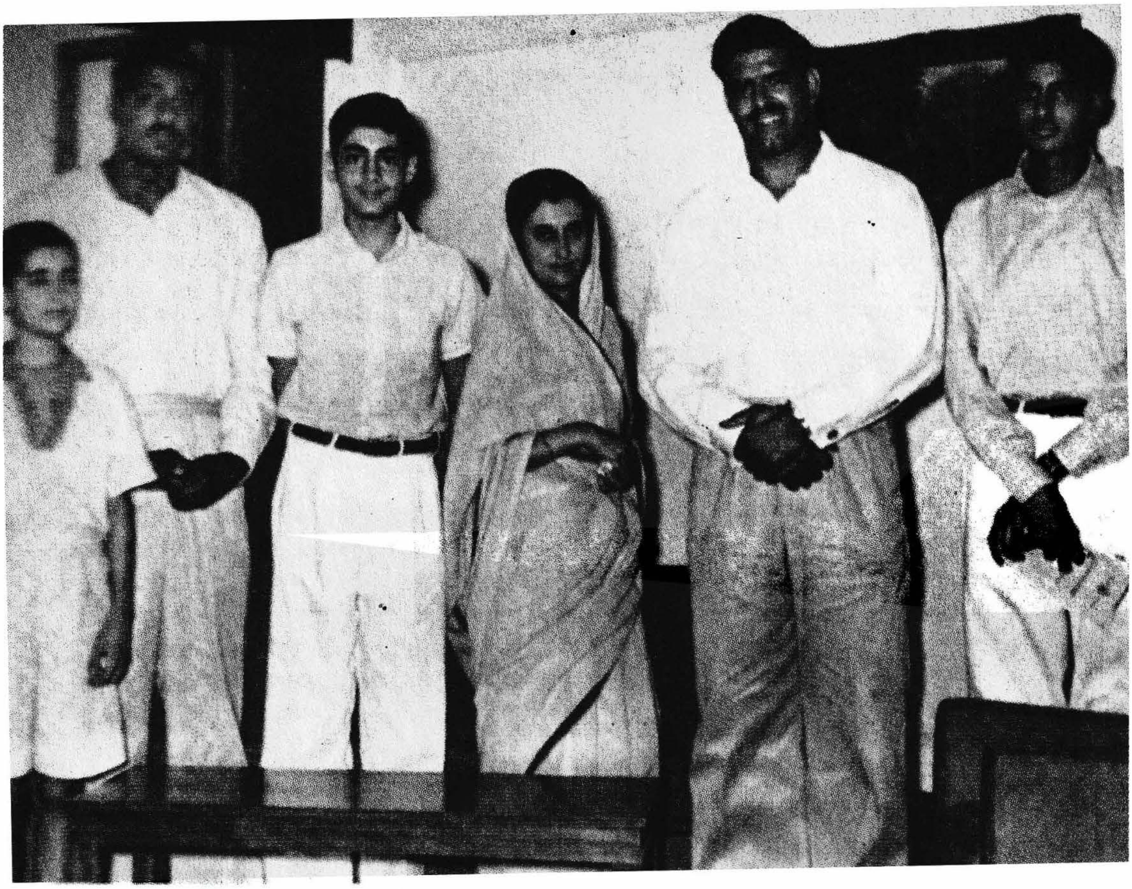
তিনি নাকি অপূর্ব সুন্দরী, কচ্চিৎ তাঁকে বেরোতে দেখা যায় এবং জনশ্রুতি ছিল, খুব অল্প দু-একজন তাঁকে হয়তো কখনও দেখেছে ... এমনই রহস্যে মোড়া সেই অলৌকিক সুন্দরী। মনে আছে মা'র ড্রেসিং টেবিল থেকে পয়সা চুরি করে ওই বাড়ির দরোয়ানকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেছি কতবার। যদি একবার, এক ঝলক আমার সেই রহস্যময়ী রানি বিটিয়াকে দেখতে দেয়। দরোয়ান প্রত্যেকবার বলত দেখাবে। আমার থেকে পয়সাটা নিত, কিন্তু কোনও দিন দেখাত না।

বহু বছর পর তখন এলাহাবাদে ইলেকশন ক্যাম্পেন করছি। কাচ তোলা গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে গেছে কোনও একটা জনসভায়। মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি—এই তো সেই থর্নহিল রোড। আর উল্টোদিকেই ছোটবেলার সেই রহস্যঘেরা দুর্গবাড়ি। শৈশবের দেখা সেই বাড়িটিকে এখন আর অতবড় লাগছে না। আর যে মঞ্চটায় আমি দাঁড়িয়ে, সেটাও বেশ উঁচু, ফলে বাড়ির ভিতরটা এখন অনেকটা দেখা যাচ্ছে। অযত্নে মলিন, অবাঞ্ছিত লতাপাতার ঝাড় ঢেকে দিয়েছে বাড়ির অনেকটা, কিছু পুরনো আসবাব, খালি বারান্দা ... কিন্তু রানি বিটিয়াকে এবারও দেখতে পেলাম না।

ছোটবেলায় আমাদের বেড়াতে যাওয়ার একটা খুব পছন্দের জায়গা ছিল এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি। ইউনিভার্সিটি বাড়িটা বড় সুন্দর ছিল। যেন প্রাসাদের মত। তখন ভারতবর্ষে চারটে ইউনিভার্সিটি বিখ্যাত— কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ এবং এলাহাবাদ। ব্রিটিশ এবং মুঘল আর্কিটেকচারের এক অপূর্ব সমন্বয়, কুতুব মিনারের মতো একটা উঁচু স্তম্ভ ছিল। তখনও আমি দিল্লি যাইনি। কুতুবও দেখিনি। ফলে বিস্ময়ে বার বার করে ইউনিভার্সিটি বাড়িটা দেখতাম। বাগানে খেলতাম। ছবির গ্যালারিগুলোয় ঘুরে বেড়াতাম নিজের মনে। কখনও,



বাবা আর ভাই অজিতাভ



ইন্দিরা, রাজীব, সঞ্জয় এবং দারা সিং এর সঙ্গে

বাবা যখন পড়াচ্ছেন ক্লাসে ঢুকে, কোনও একটা খালি বেঞ্চে বসে থাকতাম।

একবার মনে আছে একটা সাতদিন ব্যাপী সাঁতার প্রতিযোগিতা হয়েছিল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে। এক এক করে সব প্রতিযোগী আউট হয়ে গেল। একজন কেবল শেষ অবধি সাঁতার কেটে গিয়েছিল। সে প্রায় ছ'দিন ধরে হবে। অবাক হয়ে দেখতাম, তার সহ্য শক্তি, লড়ে যাওয়ার ক্ষমতা ... জানি না মনে মনে কখন তাকে আমার নায়ক বানিয়ে ফেলেছি। ছোটবেলার কথা তো, সব কিছু স্পষ্ট মনে নেই। কেবল মনে আছে সারারাত আলো জ্বলছে। ভিড় করে লোক, মাইকে গান হচ্ছে। দিলীপকুমারের ছবি, কী যেন একটা গান ফিরে ফিরে বাজছে। আমার ছোটবেলার দেখা সেই লড়াকু নায়ক আর আমার ভবিষ্যতের আইডল কখন যেন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। নায়করা বোধহয় এরকম করেই জন্মায়।

এই ব্যাঙ্ক রোডের বাড়িতেই আমি প্রথম রাজীবকে দেখি। শুনেছি একটা ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি হয়েছিল। তাতে রাজীব সেজেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী। মা বলেছিলেন, ও নাকি প্যান্টে সুসু করে ফেলেছিল। আমরা তখন সবাই খুব ছোট। নিজেদের খেলাধুলো নিয়ে নিজেরা মেতে আছি পণ্ডিত নেহেরুর নাতি যে আমাদের বন্ধু, আমরা এক সঙ্গে খেলি —তাতে কিছু আসত যেতও না।

বাবুজি তখন UOTC (University Officers' Training Corps) এ যোগ দিয়েছেন। রোজ দেখতাম মিলিটারি ইউনিফর্ম পরে মিলিটারি ক্যাম্পে চলে যেতেন। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে গেল গান্ধীজির শেষ শোভাযাত্রা। অ্যালফ্রেড পার্কের পাশে একটা সরু গলি দিয়ে মিছিলটা চলে গেল আমার মনে আছে। অ্যালফ্রেড পার্কই সেই পার্ক যেখানে চন্দ্রশেখর আজাদকে গুলি করে মারা হয়েছিল। যে গাছের আড়ালে উনি লুকিয়েছিলেন সেই গাছটা এখনও আছে। শুনেছি মোতিগঞ্জে আমাদের পৈতৃক বাড়িতে একবার চন্দ্রশেখর আজাদ এসে লুকিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন —আমার ঠাকুর্দা নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত ছিলেন।

সেই গলির ধারে বহু মানুষের মধ্যে আমিও মা'র হাত ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলাম গান্ধীজির শেষ দর্শনের জন্য। একসময় শোভাযাত্রা চলে গেল চোখের সামনে দিয়ে। পণ্ডিতজি বসে আছেন ঠিক গান্ধীজির মরদেহের পাশটিতে। আর মিছিলের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন বাবা UOTC-র মিলিটারি ইউনিফর্মে। শোক যে মানুষকে কেমন করে অমন দৃপ্ত ভঙ্গি দিতে পারে জানি না। শুধু দেখছি ... মা আমায় ধরে কাঁদছেন। দেখাদেখি আমার চোখও ভরে আসছে বাষ্পে ... চলছে শোভাযাত্রা। আর আমার কাছে বার বার গুলিয়ে যাচ্ছে কে তাহলে আসল নায়ক। গান্ধীজি না বাবুজি?

ব্যাঙ্ক রোডের পালা শেষ হয়ে এল। আবার আমরা নতুন বাসায়। এলাহাবাদ-এ আমাদের তৃতীয় আস্তানায়। সতেরো নম্বর ক্লাইভ রোড-এর বাড়িতে। বিশাল বাড়ি ছিল ক্লাইভ রোড-এর বাড়িটা। চার ভাগে ভাগ করা।


উষ্ণতা
প্রতি পদে
Enjoy (60445)
Rs. 119
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
ক্যানভাসের তৈরী, হালকা ও আরামদায়ক
ভিতরে প্যাডিং এর জন্য পা থাকবে উষ্ণ ও শুষ্ক
Genesis 2288

চারটি পরিবার থাকতেন বাড়িতে। আমরা সামনের বাঁ দিকে থাকতাম। বাড়িওয়ালা, মিঃ মল থাকতেন ছাদের বরসাতিটুকু নিয়ে। এই প্রথম নিজের একটা ঘর হল। এই প্রথম বুঝলাম একটা বড় বাড়িতে হাত পা মেলে থাকার আনন্দ।

বাবুজি যে ঘরে বসে লিখতেন সেখানে দশটা খোলা জানলা দরজা ছিল। পরে যখন বাবা আত্মজীবনী লিখেছেন চার খণ্ডে—তার একটার নাম দিয়েছেন 'দশদ্বার সে সোপান।' আমাদের দিল্লির বাড়িটার নাম সোপান। এলাহাবাদ থেকে দিল্লি —এই অদ্ভুত যাত্রাটা বাবার এই আত্মজীবনীতে।

এই প্রথম আমাদের বাড়িতে রান্নার লোক এল, মহারাজ নিরামিষ রান্না যে কী ভাল রাঁধত। আমি আর বান্টি (অজিতাভ) পাগলের মত খেতাম।

একদিন দুপুরবেলা আমি, বান্টি আর মহারাজ বাইরে সিঁড়িতে বসে এক বালতি ঠাণ্ডা জলে ভেজানো চুসনি আম খাচ্ছি। এমন সময় বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক কয়েকজন গুণ্ডা টাইপ লোক এনে হঠাৎ আমাদের উপর চড়াও হলেন। কারণটা এখন আমার আর মনে নেই। আমরা তিনজন ভয়ে সোজা চম্পট, বাড়ির ভিতরে। ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারা তো ছাড়ার পাত্রই নয়। সমানে দরজায় ধাক্কা দিয়ে চলল। পারলে দরজা ভেঙে ঢোকে।

মা ঘুমোচ্ছিলেন। গোলমাল শুনে উঠে পড়লেন। সেই দেখেছিলাম মার বাঘিনীর রূপ। রাগে খাটের ছত্রী খুলে নিয়ে তাড়া করে গিয়েছিলেন, পারলে বাড়িওয়ালাকে মেরেই ফেলেন, এর মধ্যে বাবা পি এইচ ডি করতে লন্ডন গিয়েছেন। আমার তখন দশ বছর বয়স। বান্টি সবে পাঁচ পূর্ণ করেছে। বাবা যখন বিলেত যান, আমার ওপরে পুরো বাড়ির দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। এখন বুঝতে পারি ওটা বাবার একটা কৌশল ছিল। জানতেন, আমার খুব মন খারাপ হবে। আমি কান্নাকাটি করব। তাই আমাকে ভোলানোর জন্যই যেন আমার ওপর চাপিয়ে দিলেন বাড়ির দায়িত্ব। আমিও যেন নতুন পাওয়া খেলনার মত 'ও আমি তো এখন বড় হয়ে গেছি। আমাকেই তো সব দেখতে হবে' ভেবে দুঃখটুঃখ ভুলে গেলাম।

এখন বুঝতে পারি, লন্ডনে একা যখন ছিলেন আমাদের ছেড়ে বাবাও বড় কষ্টে ছিলেন, নিয়ম করে চিঠি লিখতেনর আমাকে, বান্টিকে। বারবার করে বলতেন 'ঠিক করে থাকবে, মাকে দেখবে।' পিকচার পোস্টকার্ড আসত। রানির করোনেশন-এর একটা পপ-আউট কার্ড পাঠিয়েছিলেন মনে আছে। আমার জন্য নানারকম খেলাধুলোর বই পাঠাতেন। অলিম্পিকস-এর বই। আমি যখন প্রথম বক্সিং-এ ভর্তি হলাম খবর পেয়ে বক্সিং-এর একটা বই পাঠালেন। ভিতরে লিখে দিলেন —Good hard blows are a delight to the mind! একটা বড় ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস পাঠিয়েছিলেন। তখন সেই বইগুলোর কত দাম। পিএইচডি শেষ করে বাবা যখন এলাহাবাদ ফিরলেন স্টেশনে হাজারে হাজারে লোক গিয়েছিল তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে। বাড়িতে নিয়মিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, পৃথ্বিরাজ কাপুর এবং সুমিত্রানন্দন পন্থ—আমার নামকরণ করেছিলেন যিনি। সারাক্ষণ বাড়িতে হই চই চলছে। যে কোনও সান্ধ্য আড্ডা কখন যেন কবি সম্মেলন হয়ে যাচ্ছে।

বিলেত থেকে ফেরার পর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারে বাবার মন ভেঙে গেল। পিএইচডির পর আমরা সকলেই বাবার পদোন্নতি আশা করেছিলাম। বরং উল্টে ওরা বাবার মাইনে কেটে নিল। বাবা এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিলেন। কিছুদিনের জন্য আকাশবাণী জয়েন করলেন। এরপর পণ্ডিত নেহেরু বাবাকে বললেন এক্সটারনাল অ্যাফেয়োরস-এ হিন্দি বিজ্ঞাপনের দেখাশোনা করতে। আমরা এলাহাবাদ ছেড়ে দিল্লি চলে এলাম।

> এই ব্যাঙ্ক রোডের বাড়িতেই আমি প্রথম রাজীবকে দেখি। একটা ফ্যান্সি ড্রেস পার্টিতে রাজীব সেজেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী...

তখনই আমার আর বান্টির নৈনিতালে শেরউড-এ পড়তে যাওয়ার কথা হল।

এলাহাবাদ থেকে দিল্লি যাওয়াটা এখনও মনে আছে। মা আমাদের দুজনকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। একাট ফোর্ড পারফেক্ট গাড়ি। সারারাত ধরে যাচ্ছি আমরা। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। গাড়ি ভর্তি মালপত্র। রাস্তাভর্তি খানাখন্দ। তার মধ্যে অবিচলিত হয়ে মা, সেই সময়ের এক মহিলা, আমি ১৯৫৪-র কথা বলছি, একা, কেবল দুটো বাচ্চাকে নিয়ে সারারাত ধরে গাড়ি চালিয়ে দিল্লি যাচ্ছেন স্বামীর কর্মস্থলে।

বাবা তখনও তেমন রোজগার করেন না। মাসে হাজার টাকার মতো। আমাদের শেরউড পাঠাবেন বলে সারারাত কবি সম্মেলনে গিয়ে আবৃত্তি করতেন। কখনও দুশো টাকা পেতেন, কখনও তিনশো।

যেদিন শেরউড রওনা দিলাম, দিল্লি থেকে ট্রেন ছাড়ল নৈনিতালের দিকে। আমার কিন্তু একটুও কষ্ট হয়নি। বগি ভর্তি আরও দুশোটা ছেলে —আমরা সবাই নতুন স্কুলে যাচ্ছি। আর আমার সেই প্রথম নতুন সেলাই করা ব্লেজার হয়েছে- আমি সেই নিয়েই মত্ত।

বাবা, মা স্টেশনে ছাড়তে এসেছিলেন। হাসিমুখে হাত নেড়ে বিদায় দিলেন মা। এমনিতেই শক্ত মনের মানুষ, কান্নাকাটি মা'র ধাতে নেই বড় একটা।

ট্রেন ছেড়ে দিল। আমরা দু,ভাই হাসিমুখে হাত নেড়ে বিদায় দিলাম বাবা মাকে। আমি তখনও নতুন সেলাই করা কোটের গন্ধে মশগুল। কিছুটা যাওয়ার পর বান্টি একটু উশখুশ করতে লাগল। বুঝলাম ও এবার বাড়ি ফিরে যেতে চায়। নতুন কোট আর ট্রেনে চড়ার মজা ওর কাছে শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি চুপি চুপি যত ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি যে আমরা নতুন স্কুলে যাচ্ছি, ও তত বাড়ি ফিরতে চায়। দেখলাম ধীরে ধীরে ওর ঠোঁট ফুলছে। চোখে জল। ইস! কি লজ্জা। এতগুলো নতুন ট্রেনভর্তি ছেলের সামনে ও যদি

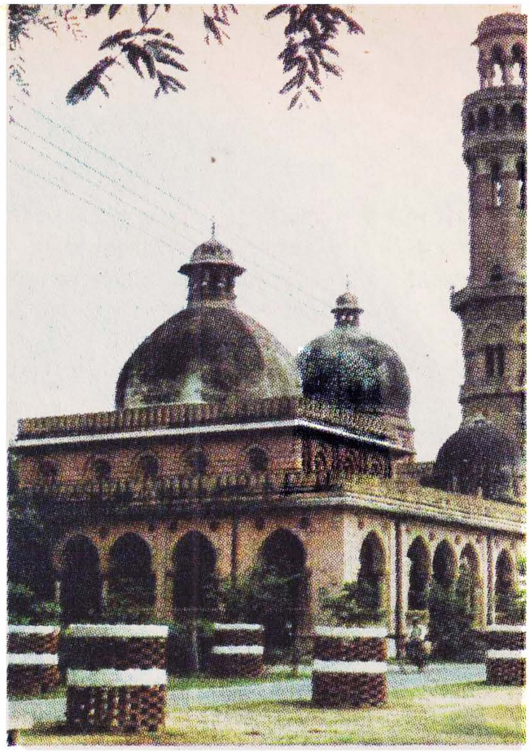
এখন কান্নাকাটি করে? ওরা কী ভাববে আমাদের। তাড়াতাড়ি ওর মুখটা টেনে নিলাম আমার বুকের মধ্যে- যাতে আর কেউ বুঝতে না পারে যে ও কাঁদছে। আমার বুকের মধ্যে মুখটা রাখতেই বান্টির এতক্ষণের চেপে থাকা কান্না যেন উগরে এল।

ট্রেনের কোনও ছেলে বুঝতে পারছে না। কেবল আমি জানি বান্টির চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে আমার নতুন ব্লেজার। আমি শক্ত করে ধরে আছি ওর মাথাটা। অন্যরা যাতে সে কান্না না দেখে। কখন জানি না; ধীরে ধীরে আমার শক্ত মুঠি আলগা হল। আমার আঙুলগুলো আপনিই নরম হয়ে বোলাতে শুরু করল বান্টির চুলের ভিতর। ঘুমোনোর সময় মা যেমন আদর করে চাপড় মারতেন আমার আঙুলগুলো যে কখন সেটা শিখে ফেলেছে জানিও না।

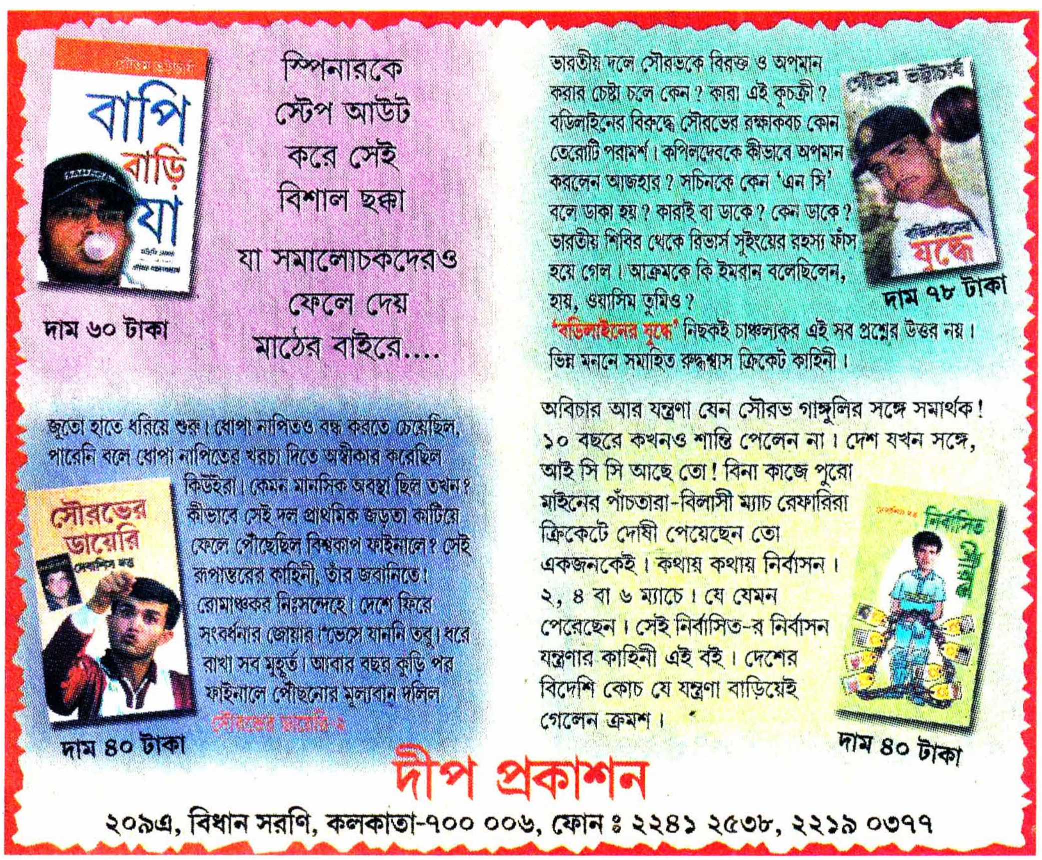
কেবল বুঝতে পারলাম, আমি বড় হয়ে গেছি।

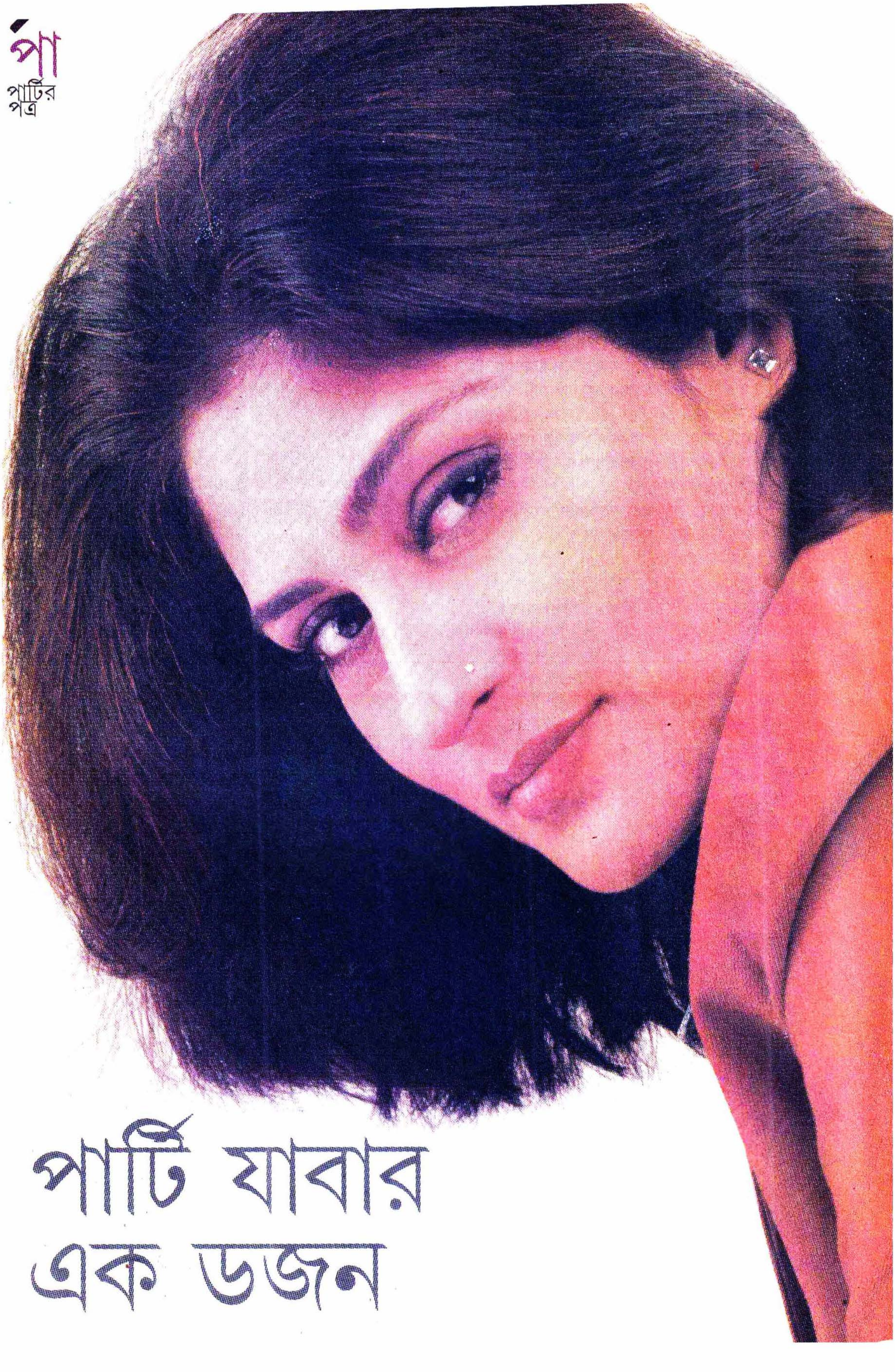
(চলবে)

ব্যবহৃত সব ফোটোগ্রাফ জয়া বচ্চনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নেওয়া।



এলাহাবাদ-এর কুতুব, শৈশবের বিস্ময়





পার্টি যাবার এক ডজন

বছর শেষ। কলকাতা জুড়ে কত পার্টি। নানা নেমন্তন্ন। পার্টি দেওয়ার মতো পার্টিতে যাওয়াটাও একটা আর্ট। কী পরবেন? কী দেবেন উপহার? প্রচুর প্রশ্ন এসেছিল রোববার-এর দপ্তরে। রূপা গাঙ্গুলি বেছে নিলেন তার সেরা বারোটি। যা দিয়ে মোটামুটি ধরা যায় পার্টিতে যাবার অ্যাটিট্যুড

পার্টির পর পার্টি, নেমন্তন্নর পর নেমন্তন্ন, সব জায়গায় কি যেতে ইচ্ছে করে? কিন্তু না-ই বা বলি কী করে?

আলপনা দাশগুপ্ত, পাইকপাড়া

সবাইকে তো না বলছেন না। কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে না বলতে হ'তে পারে। কিছুটা নির্ভর করছে নেমন্তন্নর ধরনটা কীরকম তার উপর।

ধরুন, তেমন ঘনিষ্ঠ কেউ নয়, কেবল সামাজিকভাবে চেনেন মাত্র--সেক্ষেত্রে ফর্মাল ইনভিটেশনের উত্তরে আর এস ভি পি পাঠিয়ে দেওয়াটাই শ্রেয়। সেটা আপনার অফিসের সেক্রেটারিও করতে পারে, বা বাড়ির কেউও করতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা বেমানান। যেমন ধরুন, কোনও ঘরোয়া অনুষ্ঠান বা বিশেষ চেনা কেউ।

সত্যিকারের কোনও কারণ থাকলে তো মিটেই গেল। কিন্তু অজুহাত দিয়ে যদি এড়াতে হয় তা হলে সেটা অনেক আগে থেকেই করুন। বলতে পারেন, 'আমরা থাকছি না, আগে থেকেই প্ল্যান করা ছিল।' কিংবা, 'বাড়ির কোনও বয়স্ক লোককে ঘিরে একটা অনুষ্ঠান ঠিক করা হয়েছে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারব না।' কারণ হিসেবে এটা বেশ মানবিক। 'অমুক অসুস্থ', 'তমুক হাসপাতালে' বলতে নিজেরও খারাপ লাগে, আর অনেক সময় এটা জানাজানি হয়েও যায়। সেটা অস্বস্তিকর।

তবে যা বলবেন তাড়াতাড়িই বলুন। চেষ্টা করবেন ই-মেল বা এসএমএস করে জানিয়ে দেওয়াটা অ্যাভয়েড করতে। দুকলম লিখে কারও হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারেন। আর সব থেকে ভাল হয় সরাসরি একটা ফোন করলে।

একেবারে 'না' বলে দেবেন না। 'খুব চেষ্টা করছি' কথাটার মানেই কিন্তু আপনি আসছেন না। সেটা যিনি নেমন্তন্ন করছেন তিনিও জানেন, আপনার দিক থেকেও সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলা হল না।

আর এস ভি পি কথাটা শুনি বা দেখি। পুরো মানেটা জানি না।

পলাশ বসু, কসবা

আর এস ভি পি কথাটা এসেছে ফরাসি বাক্যাংশ RÈpondez s'il vous plaît যার মানে নিমন্ত্রণকর্তা বা কর্ত্রী জানতে চাইছেন আপনি নেমন্তন্ন গ্রহণ করতে পারছেন, না পারছেন না।

আমরা ভারতীয়রা সাধারণত এটাকে বিশেষ পাত্তা দিই না। কিন্তু, মনে রাখবেন যিনি নেমন্তন্ন করছেন তাঁর জন্য এটা জানা খুব জরুরি হতে পারে। আমরা ভাবি—কী আর হবে, একটু খাবার নষ্ট হবে। ব্যাপারটা কিন্তু অনেক সময়ে তার থেকে অনেক বেশি সিরিয়াস।

গৃহস্বামী হয়তো সেইভাবে টেবিল সাজাবেন। হয়তো, ছোট একটা গেট টুগেদারে সামান্য হাতে গোনা কয়েকজন অতিথি রয়েছেন—সেখানে আপনি আসবেন না সেটা আগে থেকে জানা থাকলে আপনার চেয়ারটা সরিয়ে রাখা হবে। অনেক সময়ে ফর্মাল ডায়েটিং টেবিলে একটা চেয়ার খালি পড়ে থাকলে সেটা ভাল দেখায় না।

প্রথমে ভেবেছিলাম যাব—এখন লাস্ট মোমেন্টে ইচ্ছে করছে না। এরকম তো অনেক সময়ই হয়। তখন?

তমালিকা রায়, বিরাটি

'ইচ্ছে করছে না' টা একটা অত্যন্ত খারাপ এবং ক্ষমাহীন অসুখ। হ্যাঁ, অফিসের কোনও একটা হঠাৎ-ডাকা জরুরি মিটিং-এ আটকে গিয়েছেন, বাড়িতে কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কিংবা, অন্য শহরে ছিলেন, ভেবেছিলেন বিকেলবেলা ফিরে এসে যাবেন ... কিন্তু সেখান থেকে প্লেন ছাড়তেই দেরি করল। এসব ক্ষেত্রে আপনার সত্যিই কিছুই করার নেই।

'ইচ্ছে করছে না' কথাটার আসল মানে হল আলসেমি। কুঁড়েমি ঝেড়ে ফেলে উঠুন। ভাল করে স্নান করুন। অন্তত আধঘণ্টার জন্য মুখ দেখিয়ে চলে আসুন। এটা ধরে নেবেন না যে, কত লোক তো আসবে—আপনি গেলেন কি গেলেন না, সেটা কি আলাদা করে কেউ খেয়াল করবে?

অনেক সময় পার্টিতে গিয়ে মনে হয় আর ভাল লাগছে না, এবার বাড়ি যাই। সেক্ষেত্রে কী করব?

তনুশ্রী মজুমদার, নিমতা

গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রীকে একটু আলাদা করে ডেকে বলুন। 'মাথা ধরেছে', 'শরীরটা তেমন ভাল নেই' এমন কিছুও বলতে পারেন। তাঁরা খেয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে পারেন, সেটাই স্বাভাবিক।

তেমন অসুবিধে না হলে একটা আইসক্রিম বা মিষ্টি প্লেটে তুলে নিন। আর সত্যিকারের ঘনিষ্ঠ কেউ হলে আসল কথাটা বুঝিয়ে বলুন। সেক্ষেত্রে বলতেও পারেন কিছু খাবার প্যাক করে দিতে।

অনেকে ভাবেন সেটা হ্যাংলামি! মোটেও না। এই ধরনের আবদারের উষ্ণতা যে কোনও গৃহস্বামীকেই খুব আনন্দ দেয়।

বাড়িতে যেমন আছি তেমন ভাবেই তো আর পার্টিতে যাওয়া যায় না। তার জন্য সাজগোজ করতে হবে তো? বেশিরভাগ সময় তৈরি হওয়াটাই তো বিরক্তিকর! তখন?

ঝুমা সাহা, গড়িয়া

একেবারে না যাওয়ার থেকে কম সেজে যাওয়া ভাল। তবে সাধারণত লোকে আপনাকে যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত তার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখবেন।

ধরুন, আপনি সাধারণত সিল্ক ছাড়া পরেন না। ইচ্ছে করছে না বলে একটা সাধারণ সুতির শাড়ি পরে চলে গেলেন—তাতে আপনার হয়তো ঝঞ্ঝাট কমল, কিন্তু নিমন্ত্রণকর্তার মনে হতে পারে তাঁর এই আমন্ত্রণটাকে আপনি যথেষ্ট গুরুত্ব

দেননি।

আর মহিলাদের তৈরি হওয়ার বেশিরভাগ সময়টাই চলে যায় প্রসাধনে। আজকে না হয় একটু হাল্কা মেকআপ করুন। ধরুন, শুধু ভুরুটুকু না আঁকলেই নয়, সেটুকুই করলেন। কমপ্যাক্ট আর লিপস্টিক নিশ্চয়ই আপনার ব্যাগেই আছে। গাড়িতে যেতে যেতে একটু বুলিয়ে নিন।

বরং সম্পূর্ণ অন্যরকম কিছু ট্রাই করে দেখতে পারেন। ধরুন আপনি যে কোনও অনুষ্ঠানেই কালো বা নেভি-ব্লু স্যুট বা জ্যাকেট পরে যান, আজকে না হয় একটা উজ্জ্বল রঙের খদ্দরের পাজামা-পাঞ্জাবি পরলেন। 'স্যুট বের করো রে', 'ম্যাচিং টাই বের করো', সে সব ঝামেলাও রইল না, আর সকলে ভাবলো আপনি ইচ্ছে করেই অন্যরকম সেজেছেন।

আজকাল আবার একরকম ঢং হয়েছে। অনেকেই কার্ডের তলায় লিখে দেন, 'আমরা উপহার নিই না'। একদম খালি হাতে লোকের বাড়ি যাওয়া যায়, বলুন?

মনোরমা গুহ, ভবানীপুর

এটা ঢং নয়। নিমন্ত্রিতের প্রতি একটা বাড়তি সম্মান। মনে মনে অনেকেই এই ধরনের কার্ড পেলে ভেতরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। কারণ অনেকের কাছে আজও নেমন্তন্ন বাড়ি মানেই—গচ্চা।

গৃহস্বামী আপনাকে চাইছেন আপনার উপস্থিতির জন্য, আপনার উষ্ণ শুভেচ্ছার জন্য, আপনার উপহারের জন্য নয়—এটার মধ্যে আপনার এবং তাঁর দুজনেরই একটা বেসিক ডিগনিটি আছে। সেটা ছোট করে দেখার অধিকার কারও নেই।

আবার অন্যদিকে, এতদিনের সংস্কারবশত আমরা উপহার হাতেই নেমন্তন্ন বাড়ি যেতে অভ্যস্ত।

ফুল নিয়ে যাওয়ার অপশনটা খুব সহজ, কিন্তু মনে রাখবেন এটাও অত্যন্ত প্রচলিত এক উপহারবিকল্প। অনেকেই হয়তো তাই করবেন। এবং অত ফুল নিয়ে গৃহস্বামীকে বেশিরভাগ সময়েই হিমসিম খেতে হয়। বরং দুদিন পরে ছোট দু-লাইন 'আন্তরিক ধন্যবাদ' লিখে সঙ্গে ফুল পাঠিয়ে দিন।

যাঁরা সৃষ্টিশীল কাজ করেন নিজেদের কাজের দু-একটা টুকরো স্বচ্ছন্দে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। ধরুন, কারও খালি গলায় বাড়িতে বসে দু-কলি গান গেয়েছিলেন, সেটা একটা সিডি কপি করে নিন। হয়তো অন্য কোনও গেট-টুগেদারে গৃহস্বামীর সঙ্গে তোলা কিছু ছবি আছে আপনার কাছে—তার কয়েকটা কপি করে নিয়ে যান। হয়তো এগুলো তাঁর কাছে নেই, তাঁর ভাল লাগবে।

কবি আর চিত্রশিল্পীদের তো সোনায় সোহাগা! তাদের দু-একটা ছত্র বা দু-একটা আঁচড়ের থেকে দামী উপহার আর কী হতে পারে! এটা কিন্তু কেবল পেশাদার লেখক বা ছবি আঁকিয়ের কথা বলছি না।

অল্প কদিন হল আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। ডিভোর্সটা এখনও হয়নি তবে আমরা একসঙ্গে থাকি না। যেখানে নেমন্তন্ন সেখানের সকলেই তো চেনাজানা। তাদের অনেকেই জানেন, আবার অনেকে জানেনও না। ওখানে



যাওয়া মানেই তো ওই এক কথা নিয়ে আলোচনা। নইলে, অনেকের মুচকি হাসির খোরাক হওয়া।

রূপক দত্ত, বজবজ

এই বিচ্ছেদ যদি আপনাকে এতটাই বিষণ্ণ করে থাকে যে এখন কোনও উৎসবের জন্য আপনি তৈরি নন, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু লোকজন কি বলবে সে ভেবে হাত-পা গুটিয়ে বাড়ির মধ্যে বসে থাকাটা কোনও কাজের কথা নয়।

যেতে ইচ্ছে করলে ডাঁটের মাথায় যাবেন—যেন কিচ্ছু হয়নি। যদি কেউ অশোভন কৌতূহল দেখান, নম্র অথচ দৃঢ়ভাবে বুঝিয়ে দেবেন যে সেটা আপনি পছন্দ করছেন না। আর সত্যি কথা বলতে কি—আজকাল মানুষ নিজের নানা সমস্যা নিয়ে এত ব্যস্ত যে কার বাড়িতে কি হল সেটা নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবার সময় ধৈর্য কারোর নেই। আপনি ভাবছেন সবাই আপনার এই সাম্প্রতিক বিচ্ছেদের কথাই ভাবছেন—তা আদপেও সত্যি নাই হতে পারে।

আর একটা সম্ভাবনার কথা ভুলবেন না। আপনার সদ্য সেপারেটেড স্ত্রী বা স্বামী সেখানে হয়তো উপস্থিতও থাকতে পারেন। তাঁকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলে বিদ্রূপ বা কৌতূহল বাড়বে বই কমবে না। ইচ্ছে না করলেও, অন্তত সেটুকু সময়ের জন্য একটা সুস্থ সামাজিক সহাবস্থানের ভান করুন।

ও! একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। এক্ষেত্রে একটা খুব বড় সম্ভাবনা আছে আপনার স্ত্রী বা স্বামীর কার্ড আপনার বাড়ির ঠিকানাতেই আসার। এ অবস্থায় পার্টির তারিখ, সময়, স্থানটা নোট করে নিয়ে কার্ডটা তাঁর বর্তমান ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। একটা লোভ হতে পারে তাঁর কাছ থেকে নেমন্তন্নের ব্যাপারটা চেপে যাওয়ার। তাতে করে হয়তো কিছুক্ষণের জন্য আপনার একটা সামাজিক অস্বস্তি কমবে কিন্তু নিমন্ত্রণকর্তারা যদি তাঁরও পরিচিত হন, বা আপনাদের কিছু কমন বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে খবরটা যে তাঁর

কাছে পৌঁছবে না এটা ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই।

আমার বাচ্চা ছোট। ওকে নটার সময় খাওয়াতে হয়। পার্টির মাঝখানে সে এক বিড়ম্বনা না, বলুন?

যাজ্ঞসেনী হালদার, ফুলবাগান

খুব ছোট বাচ্চা হলে বাড়িতে কারোর কাছে রেখে যাওয়াটাই সমীচীন। আপনি বরং আটটা নাগাদ গিয়ে নটার মধ্যে ফিরে আসুন, তবু গৃহকর্তা ভাববেন যে আপনি একটা চেষ্টা করেছিলেন।

আর, বাড়িতে দেখাশোনার কেউ না থাকলে বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং তার খাবারটাও। নটা বাজলে কোনও একটা জায়গায় বসে খাইয়ে দেবেন বাচ্চাকে। পার্টিতে যারা থাকবেন, গৃহস্বামী বা নিমন্ত্রিত, তাদের অনেকেই এই সমস্যার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন—দেখবেন হয়তো আমার থেকে অনেক মূল্যবান পরামর্শ তাঁরাই দিতে পারছেন।

আর পার্টি দিয়েই শুরু করুন না। এমন তো হতেই পারে, যে দুদিন পরে এমন কোথাও হয়তো আপনাকে যেতে হচ্ছে, যেখানে না গিয়ে আপনার উপায় নেই, তখনও তো ছোট বাচ্চা নিয়ে একই সমস্যা।

বাচ্চা নিয়ে বেরোতে শুরু করার এটা একটা সুন্দর অভ্যেসও তো বটে।

আমি তো নেমন্তন্নয় যাবই ভেবেছিলাম। গিফ্‌ট কেনা ছিল। শাড়ি বের করা ছিল। হঠাৎ দুদিন আগে আমার ননদ এলেন পাটনা থেকে। ওঁর কলকাতায় আসাই হয় না। এ অবস্থায় আমার স্বামী দিদিকে একা ফেলে মোটেই যেতে চাইবেন না। আমি যদি একা একা যাই, কী রকম একটা দেখাবে না?

নবনীতা পুরকায়স্থ, ট্যাংরা

নিমন্ত্রণকর্তাকে সোজা ফোন করে বলুন। উনিও যদি এটাকে অসুবিধে মনে করে ‘আচ্ছা থাক’ বলেন, তা হলে মনে হবে আপনি না গেলে ওর সত্যি কিছু আসে যায় না। সেক্ষেত্রে আপনার অনুশোচনার কোনও কারণ নেই।

কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হবে, তারা বলবেন, ‘প্লিজ ওঁকেও সঙ্গে আনুন’। সেক্ষেত্রে শেষমুহূর্তে তাঁর নামে আলাদা করে কার্ড পাঠানো হয়তো আর সম্ভব নাও হতে পারে। তবে গৃহস্বামী চাইলে নিশ্চয়ই ফোনে অন্তত তাঁকে একটা নিমন্ত্রণ করতে পারেন।

এর পরেও যদি আপনার ননদ সঙ্গে যেতে না চান, আপনি কিছুক্ষণের জন্য ঘুরে আসুন। ততক্ষণ তিনি না-হয় বাড়িতে বসে টিভি দেখলেন বা গান শুনলেন।

উপহারের সঙ্গে যে লোকে কার্ড লিখে দেয় সেটা আমার একটু জাহির করা বলে মনে হয়। কী করি বলুন তো?

তপন গোস্বামী, পাটুলি

একটু কষ্ট করে এক লাইন শুভেচ্ছাবার্তাও লিখুন।

গতানুগতিক লাইন না লিখে নিজের মন থেকে যা আসে সেটা লেখাই ভাল।

আপনি লেখক নন। আপনার কাছ থেকে কেউ কোনও পরিশীলিত গদ্য আশা করছেন না। আপনি যা লিখবেন সেটাই আপনার ভাষা। আপনি যদি জাহির করতে না চান আপনার ভাষা নিজে থেকেই নম্র হবে।

যাকে উপহার দিচ্ছেন তাকে আপনি যে নামে ডাকেন, সে নামেই শুভেচ্ছাবার্তা লেখা ভাল। নেমন্তন্ন কার্ডে হয়তো তার পোশাকি নাম ছাপা থাকতে পারে, তাই বলে আপনাকেও সেই নামেই সম্বোধন করতে হবে—তার কোনও মানে নেই।

অনেক সময় এমন হয় যে যাকে উপহার দিচ্ছেন তিনি হয়তো আপনার কলিগের মেয়ে। তাকে পোশাকি নামে ডাকাই ভাল।

অযত্নে নেমন্তন্নের কার্ডের প্রুফ দেখা হলে নামের বানানে ভুল থাকতে পারে। একটু কষ্ট করে অভিধান দেখে নিন। তৎসম ভারতীয় শব্দ হলে অভিধানে ঠিক বানানটা পাবেন। একজন অপরিচিত মানুষের কোনও একটা অজানা ভুল শুধরে দেওয়ার মধ্যে দিয়েই হয়তো আপনাদের একটা যোগসূত্র তৈরি হল।

অফিস সহকর্মীর বাড়িতে নেমন্তন্নে গেলে অনেকে আবার উপহারের সঙ্গে ভিজিটিং কার্ড আটকে দেন। দয়া করে সেটা করবেন না। অন্তত সেই সন্ধের মতো ধরে নিন যে নিমন্ত্রত আপনি, আপনার কর্মস্থলের কুর্সিটা নয়।

আজকাল তো পাত-পেড়ে নেমন্তন্ন খাওয়া উঠেই গিয়েছে। সব জায়গাতেই বুফে, তাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হয়। এইজন্য আমার নেমন্তন্ন বাড়িতে যেতে ভাল লাগে না।

স্বপ্না মালাকার, বেহালা

সত্যি, টেবিল চেয়ার পেতে পরিবেশন করে খাওয়ানোর সাবেকি রেওয়াজ হয়তো আর নেই, কিন্তু তার একটা সুবিধেও তো আছে। আপনি আপনার মতো করে আপনার পছন্দের পদগুলো বেছে নিতে পারছেন। লুচি, বেগুনভাজা শেষ হয়ে গিয়েছে, কখন মাছ আসবে বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে না।

রান্নার চেহারা দেখে যেগুলো উপাদেয় বলে মনে হচ্ছে না সেগুলোর রিস্ক নেবেন না। একটা চেয়ার টেনে নিন, বসে আস্তে আস্তে খান। কাঁটা-চামচ দিয়ে খেতে অসুবিধা হলে আঙুল ব্যবহার করতে দ্বিধা করবেন না। মনে রাখবেন বেশিরভাগ ভারতীয় রান্নাই কাঁটা-চামচ দিয়ে খাবার উপযুক্ত নয়।

খেতে খেতে অন্যান্যদের মন্তব্য থেকেই বুঝতে পারবেন কোন পদগুলো ভাল হয়েছে। 'ওমা, কিমাটা নাওনি, দারুণ হয়েছে!' বা 'আমি তো শুধু ফিস ওরলিই খেলাম'।

বুফে খাওয়ার সব থেকে বড় সুবিধে কিন্তু আপনার স্বাধীনতা। একটা সম্মিলিত স্পিডের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার কোনও দায় নেই আপনার।

আমার দিদির একবার হয়েছিল কি, কোনও একটা নেমন্তন্নে যাবে বলে দারুণ একটা কাঞ্জিভরম কিনল। ভীষণ অন্যরকম দেখতে। তার সঙ্গে অনেক যত্ন করে ব্লাউস, গয়না, ব্যাগ, চটি ম্যাচ করে পরে গেল। এমন কী আমার মনে আছে শাড়ির রঙের কম্বিনেশনের কাগজ আর ফিতে দিয়ে গিফ্‌ট ব্যাগে করে নিয়ে গিয়েছিল। নেমন্তন্ন বাড়িতে পৌঁছে দেখলো আর একজন মহিলা হুবহু একই শাড়ি পরে এসেছেন।

সুছন্দা বটব্যাল, দমদম

আমি আপনার দিদি হলে তক্ষুণি গিয়ে সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করতাম। ডেফিনিটলি তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতাম এবং তার কপি রাখতাম। নিজের প্রতিফলন দেখার এমন আকস্মিক সুযোগ ক'জনের মেলে বলুন?

আর পার্টিতে গিয়ে যদি কোন সারপ্রাইজই না থাকে তা হলে আর পার্টির মজা কীসের? রোজ সন্ধেবেলায় টিভিতে নিউজ দেখলেই হয়।



কুকি জার-এর ব্ল্যাক ফরেস্ট

কৃষ্ণ অরণ্য রক্তিম চেরি

এই স্বাদু অরণ্যের গোপন রেসিপি
খুঁজে আনলেন বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী

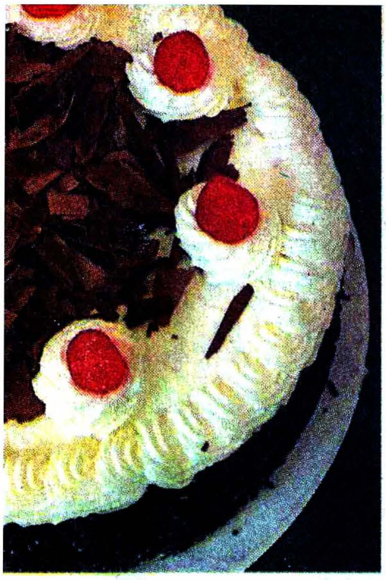
জার্মানির নির্জন অরণ্যের রহস্য। আর সেই রহস্য অন্ধকারের অপার রোমান্টিকতা। ব্ল্যাক ফরেস্ট কেকের প্রতি পরতে সেই রহস্যের আস্বাদ। আসল কথাটা একটু খটোমটো— **সোয়ার্জওয়াল্ডাদার কির্সতোর্তে**। মানে ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক।

প্রথম কবে চালু হয় জানা যায় না, তবে ষোড়শ শতাব্দীতে এই কেক পাওয়া যেত ব্ল্যাক ফরেস্ট অঞ্চলে। এখানকার বিখ্যাত চেরি, ক্রিম আর চকোলেট মিশিয়ে তৈরি হত আসল ম্যাজিক। রহস্যে আর রোমান্সে যা আজও একনম্বর।

কলকাতায় ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক মানেই কুকি জার। ১৯৮০তে লাভি বর্মন রডন স্ট্রিটে চালু করেন এই কনফেকশনারি। পরের ২৫ বছর একেবারে একচ্ছত্র জয়যাত্রা। যে জায়গাটায় লাভি অন্য সব প্রতিদ্বন্দ্বীদের মেরে বেরিয়ে গিয়েছেন তা হল কেকের কোয়ালিটি। যে দোকানের কেক, পেস্ট্রির ক্রিম, কোকো আনা হয় ইতালি থেকে, যে দোকানের ব্ল্যাক ফরেস্টে সত্যিই ব্যবহার করা হয় বিদেশি চেরি (রসে ডোবানো করমচা নয়), তারা যে অন্যদের চেয়ে আলাদা হবে তাতে আর সন্দেহ কী! দিনের খাবার এখানে দিনে বিক্রি হয়, পরদিন নয়।

শীত স্পেশালে এবার চকোলেট পিরামিড, ব্লুবেরি চিজকেক, স্পেশাল রিচ প্লাম কেক নিয়ে পসরা সাজিয়েছে কুকি জার। রয়েছে রংবেরং-এর কুকিজ, অন্যান্য স্ন্যাক্স। রডন স্ট্রিটের পাশাপাশি আলিপুরে সদ্য বানানো রেস্তোরাঁ ম্যানজিও; যার উপকরণ থেকে সাজের ধরন সবই ভীষণভাবে ইতালীয়। আছে গড়িয়াহাট মল আর সিটি সেন্টারের দু-দুটো কাউন্টার — এত কিছুর পরেও কুকি জার ভীষণভাবে ব্ল্যাক ফরেস্ট-এর। বাঙালির প্রথম তারিয়ে খাওয়া ডেসার্ট কেক। নরম চকোলেট স্পঞ্জ কেকের উপর দুধ সাদা ক্রিমের বাহারি সাজ, তার উপরে লাল টুকটুকে চেরির মুকুট।

চুলোয় যাক ডায়েটিং। এই নিউ ইয়ার্সে বাঙালি পথ হাঁটুক কৃষ্ণ অরণ্যের ছায়ায়। চাইলে আপনার আভেনেও খুঁজে পাবেন ব্ল্যাক ফরেস্টের রোমান্টিক ছোঁয়া। কেননা, ওই অরণ্য থেকে আমরা যে খুঁজে বার করেছি ব্ল্যাক ফরেস্ট কেকের রেসিপি — শুধু আপনারই জন্য।



ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক তৈরি হবার আগে একটা স্পঞ্জ কেক বানান। তার উপর অন্যান্য সব উপকরণ মিশিয়ে তৈরি হবে ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক।

পোলট্রি ডিম ২
ময়দা ১২৫ গ্রাম
ক্যাস্টর সুগার ১২৫ গ্রাম
(বদলে গুঁড়ো চিনি, মাপ একই হবে)
ভ্যানিলা এসেন্স ৮-১০ ফোঁটা
বেকিং পাউডার ১০ গ্রাম
মাখন ১২০ গ্রাম
চকোলেট পাউডার ১০০ গ্রাম

ডিম দুটো ভাল করে ফেটিয়ে নিন। ফেনা ফেনা হলে বুঝবেন ফেটানো ভাল হয়েছে।

এরপর অল্প আঁচে মাখন গলিয়ে তার মধ্যে ক্যাস্টর সুগার আর ফেটানো ডিম ভাল করে মেশান। চকোলেট পাউডারও মেশাবেন অল্প অল্প করে।

মেশানো হয়ে গেলে একটা গরম জলের জায়গার উপর পাত্রটি রাখুন । দেখবেন ভেতরের মিক্সচারটা আস্তে আস্তে ফুলে উঠছে। আলাদা একটি পাত্রে ময়দা আর বেকিং পাউডার মেশান।

আগের পাত্রে যেটা মিশিয়ে রেখেছেন ডিম, মাখন, ক্যাস্টর সুগার আর চকোলেট — সেটি এবার বেকিং পাউডার মেশানো ময়দার পাত্রে ঢালুন। খেয়াল রাখবেন যাতে ডেলা না পাকিয়ে যায়।

একটা চৌকো বেকিং ট্রেতে গলানো মাখন মাখিয়ে (গ্রিজ করে) মিশ্রণটি ঢেলে দিতে হবে।

বেকিং ট্রে-টি আভেন-এ নিচের তাকে বসান। তাপমাত্রা রাখুন একশো নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াসে। অধৈর্য হবেন না। কেকের উপরটা বাদামি হতে মোটামুটি ২০-৩০মিনিট লাগবে।

আভেন বন্ধ করে তিন চার মিনিট রাখুন। আপনার স্পঞ্জ কেক তৈরি।

এবারে ব্ল্যাক ফরেস্ট কি করে হবে। সদ্য বানানো স্পঞ্জ কেকটা প্যাস্ট্রির আকারে মোটামুটি (৮×৪ সেন্টিমিটারে) কাটুন। সঙ্গে রাখুন

ঠান্ডা ক্রিম ১০০ গ্রাম
আইসিং সুগার ২ টেবিল চামচ
(না থাকলে মিহি চিনির গুঁড়ো)
টিন্‌ড চেরি ১২টা
টিন্‌ড চেরি সিরাপ ২ টেবিল চামচ যে কোনও মিল্ক চকোলেট ১০ গ্রাম

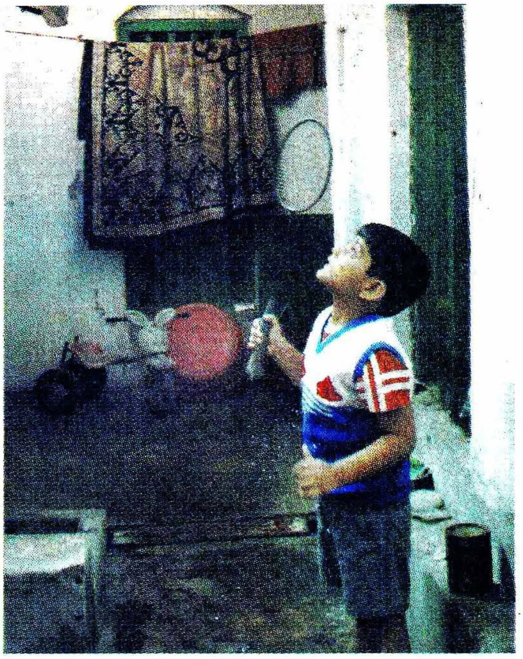
স্পঞ্জ কেকের দুটো স্লাইস নিন। মধ্যে ক্রিম আর চেরির মিশ্রণটি দিন স্যান্ডউইচের মতো করে।

ক্রিম চেরির মিশ্রণ শেষ করে ফেলবেন না। ওটা প্যাস্ট্রির উপরে ও দিতে হবে। মিল্ক চকলেট গ্রেট করে বা কুরিয়ে এর উপরে ছড়িয়ে দিন। গোটা চেরি হচ্ছে ব্ল্যাক ফরেস্টের ক্রাউনিং গ্লোরি। যত দেবেন ততই বাড়বে স্বাদ শোভা, দুই-ই।

রো
রোববার-এর
রম্যকাহিনী

আবার ডোডো তাতাই

তারাপদ রায়



সেদিন সকালবেলা ডোডোবাবু ঘুম থেকে উঠে সরাসরি তাতাইবাবুদের বাড়িতে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন। সাঙ্ঘাতিক একটা স্বপ্ন দেখেছেন কাল রাতে। এখনই না শোনালে হয়তো পরে মনে থাকবে না।

ডোডোবাবুরা একতলায় থাকেন। তাতাইবাবুরাও তাই, একটা বাড়ি আগে আর পরে। ডোডোবাবু আগে লক্ষ করে দেখেছেন তাতাইবাবুর কাকা আশেপাশে নেই, নিশ্চয় বাজারে গেছেন। সকালবেলায় ডোডোবাবু আড্ডা দিতে এসেছেন। ধরতে পারলে ধমক খেতে হবে।

এখন অবশ্য স্কুলে বড়দিনের ছুটি যাচ্ছে। খুব বেশি পড়াশুনোর ব্যাপার নেই। কিন্তু সকালবেলা না পড়ে আড্ডা দেওয়ার ব্যাপারে কাকা খুব কঠোর। তাতাইবাবুও একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছেন। তিনি উঠোনের একপাশে বাথরুমের সামনে সিঁড়িতে বসে দাঁত মাজছিলেন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে।

তাতাইবাবুর দাঁত মাজা একটা দর্শনীয় ব্যাপার। এমনভাবে হাত ঘুরিয়ে দাঁত মাজেন যে একটু দূর থেকে মনে হয় তিনি মুখের মধ্যে দিয়ে নয়, ঘাড়ের মধ্যে দিয়ে ব্রাশ ঢুকিয়ে দাঁত মাজছেন। অনেক সময় দাঁত মাজতে মাজতে ধনুকের মতো বেঁকা হয়ে যান, গলা দিয়ে ছাগলের মতো শব্দ বেরোয়।

তাতাইবাবুর সামনে গিয়ে ডোডোবাবু তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতাইবাবু তখন ঘাড় কাত করে ছাদের ভেন্টিলেটরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তখন ডোডোবাবু ওপাশের রান্নাঘর থেকে কাঁসার বাটি, গেলাস বার করে বাজাতে লাগলেন। এবার তাতাইবাবু চোখ খুললেন। তারপর ডোডোবাবুকে দেখে বললেন, সাতসকালে এসব কী ইয়ার্কি হচ্ছে?

ডোডোবাবু ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'দেখুন আপনাকে আমি কী যেন বলতে চেয়েছিলাম। খুব জরুরি। কিন্তু আপনাদের বাড়ি পর্যন্ত আসতে আসতে ভুলে গেলাম।'

দাঁত মাজা থামিয়ে তাতাইবাবু ধমকে উঠলেন, 'এ আবার কী ধরনের ইয়ার্কি?'

ডোডোবাবু বোকা বনে গিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মনে পড়ল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। তাতাইবাবু এখন মুখ ধুচ্ছিলেন। মুখ ধোয়া থামিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কী মনে পড়েছে?' ডোডোবাবু বললেন, 'একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি। আমাকে লোকে ভোট দিয়ে হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্র করেছে।' তাতাইবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। ডোডোবাবু বললেন, 'আমি স্পষ্ট দেখলুম, আমি ধৃতরাষ্ট্র। দুর্যোধন আর দুঃশাসনকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।' এবার তাতাইবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনি উজবুক মশাই। ধৃতরাষ্ট্র তো জন্মান্ধ ছিল। কী করে স্বপ্ন দেখলেন?'




EACH STEP COUNTS.
MAKE IT LARGE.
Seagram's
ROYAL
STAG
Mega
Cricket
Cricket Gear